ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

পাগলের ঝুলি

বা

ধর্ম্ম-রাজ্যের খাঁটি কথা।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীমদ্ ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ



১৩৪০ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

প্রকাশক—

ব্রহ্মচারী ওঙ্কারনাথ।

আর্য্য-ঋষিকুল-শ্রীসাধু-আশ্রম।

প্রাচীন মায়াপুর, পোঃ নবদ্বীপ,

জেলা নদীয়া।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ কৃত অন্যান্য পুস্তক—

১। চক্ষুদান বা সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য।—(ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু সন্দেহের নিরসন, বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয়, ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, উপাসনা, চরম ফল ইত্যাদি বিষয় যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।) মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৲ ও কাপড়ে বাঁধাই ২।০

২। সাধক-হৃদয়ে গুরু-বাণী।—(ব্রহ্ম-গায়ত্রী-রহস্য-সম্বলিত) (যন্ত্রস্থ)।

ব্রহ্মর্ষি শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় কৃত

১। মুক্তি-দীপ-মণিমালা।— মূল্য ।০ আনা

২। পরাশান্তি।— মূল্য ॥০ আনা

প্রাপ্তিস্থান:—

১। আর্য্য-ঋষি-কুল-শ্রীসাধু-আশ্রম। প্রাচীন মায়াপুর।
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

২। মহেশ লাইব্রেরী ১৯৫।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কুণ্ডু এল, এম্, এফ্
লক্ষ্মীনারায়ণ ফার্ম্মেসী। পোঃ ও গ্রাম খানখানাপুর।
জেলা ফরিদপুর (ই, বি, আর)।



শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সরকার

এ, বি, রেলওয়ে লোকো এণ্ড ক্যারেজ ডিপার্টমেণ্টের চিফ্ ক্লার্ক

ী, চট্টগ্রাম ।

উৎসর্গ পত্র

চট্টগ্রাম সহরের উপকণ্ঠস্থ পাহাড়তলী "এ, বি, রেলওয়ে লোকো এণ্ড্ ক্যারেজ্ ডিপার্ট্মেণ্টের্ চিফ্ ক্লার্ক্" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়ের কর-কমলে—

নগেন দাদা,

গুরুদেবের শ্রীচরণে আপনার যে অচলা ভক্তি আছে, তারি নিদর্শন-স্বরূপ অধম আমাকেও আপনি দাদা ব'লে যথেষ্ট ভক্তি ক'রে থাকেন। তাঁর ভাব-ধারা প্রকাশের জন্য আমার যে ক্ষুদ্র চেষ্টা, তাহা ফলবতী ক'র্‌বার উদ্দেশ্যেই আপনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হ'য়ে এই পুস্তক প্রকাশের ব্যয়-ভার বহন ক'রেছেন। "সংসারে পরমারাধ্য সেই সে এক জনা" এই গানটী শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের বড়ই প্রিয় ছিল। আপনারই অনুপ্রেরণায় তাহা এই পুস্তিকায় স্থান লাভ ক'রে ইহার মুকুট-মণির স্থান অধিকার ক'রেছে। ভিখারী আমি কি দিয়ে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব? এই ক্ষুদ্র পুস্তক আপনারই পবিত্র নামে উৎসর্গ ক'র্‌লাম, আর তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, আপনার সাধন-পথ সুগম হো'ক। ইতি —

প্রাচীন মায়াপুর। (নবদ্বীপ)

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী দাদা
ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ

ভূমিকা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে ব'লেছিলেন, "ভগবানের তত্ত্ব সাধারণ মানুষের কাছে রাত্রির মত অন্ধকার অর্থাৎ সেটা তারা বুঝ্‌তে পারে না, তাদের নজর সে দিকে মোটেই পড়ে না। যাঁরা ইন্দ্রিয় সংযম ক'র্‌তে পেরেছেন তাঁরা ভগবানের তত্ত্বে সর্ব্বদা জেগে থাকেন, সেটা তাঁদের কাছে দিনের আলোকের মত পরিস্কার। আবার ইন্দ্রিয়ের সুখ যাতে হয়, সেই রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ সংসারী জীবের পক্ষে দিনের মত পরিস্কার, তাতেই তারা সর্ব্বদা জেগে থাকে, তাদের ষোল আনা নজর ঐ গুলোর উপর। কিন্তু যাঁরা ভগবান্‌কে বাস্তবিকই চান, তাঁদের কাছে ওগুলো রাত্রির মত অন্ধকার, ওগুলোতে তাঁদের নজর পড়ে না।" কাজেই যাদের বিষয়-বুদ্ধি পাকা, বিষয়ের সুখ ছাড়া ধ্যান বা জ্ঞানের বিষয় যাদের আর কিছু নাই, তারা, তাদের মত যারা চলে না, তা'দিগকে পাগল ভিন্ন আর কি ভাব্‌বে? সংসারী মানুষ দেহকে যথা-সর্ব্বস্ব ভেবে তারই সুখের ভাবনায় ব্যস্ত। সমাজের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্যের নীতি, এ সব বিষয় ভাব্‌বার অবসর তাদের মোটেই নাই; যদিও কেউ কিছু ভাবে, তবে সেটা তার নিজের স্বার্থের সঙ্গে যতটুকু খাপ্ খায় ততটুকুই ভাবে, তার বেশী নয়। কাজেই ও সব বিষয়ে দেশাচার লোকাচার কুলাচার যা মামুলি-ভাবে চ'লে আস্‌ছে, তারই যতটা খেয়াল মত হয়, তাই তারা মানে, আর কিছুর ধার ধারে না। কিন্তু দেহ ছাড়াও যে আর একটা কিছু আছে, এ জীবনের পরও জীবন আছে, এটা যারা জানে, তারা ত বিচার না ক'রে, শাস্ত্রাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষা ক'রে, যা খুসি তাই ব'ল্‌তে বা ক'র্‌তে

পারে না। সুতরাং মামুলি কথা ও মামুলি প্রথার সঙ্গে অনেক যায়গায়ই তাদের কথা ও কাজের মিল দেখা যায় না। সেইজন্য, মামুলির দল সংখ্যায় জঁাকাল হওয়ায়, ঐ দলের লোককে পাগল ব'লে উড়িয়ে দিতে চায়। উড়িয়ে দিতে চাইলে হবে কি? যদি প্রকৃত মঙ্গল আন্‌তে হয়, প্রকৃত সুখ পেতে হয়, তবে সত্যকে সুবোধ ছেলের মত মাথা পেতে স্বীকার ক'র্‌তেই হবে, নৈলে প'চে গ'লে ম'র্‌তে হবে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের পদ-ধূলি মাথায় মেখে, ঐ শ্রেণীর পাগলের কথা ও ভাব কিছু কিছু তাঁদের ঝুলি থেকে নিয়েছি এবং মানুষের হিতের জন্য বিতরণ ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রেছি। আশা করি, উদার পাঠক মহাশয়দের নিকট ইহা অনাদরের বিষয় হবে না।

অতি অল্প লেখাপড়া জানা লোকদের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে ভাষা খুব সোজা করা হ'য়েছে।

[স্মরণ না হওয়ায় একটী অতি আবশ্যকীয় প্রমাণ যথাস্থানে দিতে পারি নাই। পুস্তক-ছাপা প্রায় শেষ হবার পর উহা মনে হওয়ায় এই ভূমিকার মধ্যে এই স্থানে উহা দিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ, দয়া ক'রে এটা যথাস্থানে যোগ ক'রে পাঠ ক'র্‌বেন। ৬৫ পৃষ্ঠা ১৪ পংক্তিতে আছে, "খুব সম্ভব, এই কথার ফলে হ'য়েছে কি, না তুমি যে আচারের কথা ব'ল্‌লে সেই আচার!" শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেও ঐ সিদ্ধান্তই আছে। একান্ত ভক্ত রঘুনাথ দাস বিষয় ছেড়ে নীলাচলে এসে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছেন। রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন দাস খুব অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। একমাত্র পুত্র রঘুনাথ নীলাচলে ভিক্ষা ক'রে খায়, কোনদিন বা অন্নাভাবে উপবাস করে; এ কথা শুনে গোবর্দ্ধন দাস মনে বড় দুঃখ পান ও চারশ' টাকা, দুইজন চাকর এবং একজন পাচক ব্রাহ্মণ শিবানন্দ সেনের সঙ্গে রঘুনাথের নিকট পাঠিয়ে দেন। রঘুনাথ সে টাকা গ্রহণ না করায়,

যারা টাকা এনেছিল তাদের মধ্যে দুইজন টাকা সহ সেইখানেই থেকে গেল, ফিরে গেল না। রঘুনাথ অগত্যা ঐ টাকা থেকে কিছু কিছু এই ভাবে খরচ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন ঃ—প্রতি মাসে দুই দিন অতি যত্নের সহিত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। দুই বৎসর এরূপ করার পর তিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করা ছেড়ে দিলেন। দুইমাস নিমন্ত্রণ না পাওয়ায় মহাপ্রভু একদিন স্বরূপকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। স্বরূপ গোস্বামী সে কথার উত্তরে বলেন, "বিষয়ীর দ্রব্য নিয়ে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করি, এতে তাঁর মন প্রসন্ন হয় না, বোধহয় এইরূপ বিচার ক'রেই সে আর আপনাকে নিমন্ত্রণ করে না।" এ কথা শুনে মহাপ্রভু একটু হাস্য ক'রে ব'ল্‌লেন ঃ—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এতদিন নিল।
ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥"]

লোকের হিত হোক্, ইহাই শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা। ইতি –

আর্য্য-ঋষি-কুল-শ্রীসাধু-আশ্রম
প্রাচীন মায়াপুর, (নবদ্বীপ)
১৩৪০। ১৫ই কার্ত্তিক।
রাসপূর্ণিমা।

ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ।

সূচী পত্র।

শুদ্ধিপত্র।

		অশুদ্ধ কবা	শুদ্ধ করা।
৬ পৃষ্ঠা	৪র্থ পংক্তি		
৭ "	৯ম "	" না বেশে	" না বেসে।
১১ "	২৪শ "	" তার	" তাঁর।
১১ "	শেষ পংক্তি	" কিছ	" কিছু।
১৪ "	১৯ "	" দেহভিমানী	" দেহাভিমানী।
২১ "	৬ষ্ঠ "	" প্রতিপ্রত্তি	" প্রতিপত্তি।
২৪ "	৪র্থ "	" আজ্ঞ	" আজ্ঞে।
২৭ "	১৬শ "	" কাপড	" কাপড়।
২৮ "	১৮শ "	" কাছে	" আছে।
৩২ "	শেষ পংক্তি	" স্ত্রীলোকও	" স্ত্রীলোক ও।
৪৮ "	১৯শ "	" নবক	" নরক।
৫৫ "	৯ম "	" তথই	" তখন।
৫৯ "	১ম "	" হ'য়েছ	" হ'য়েছে।
৬৫ "	১৬শ "	" 'অন্ন খাইলে	" 'অন্ন খাইলে'।
৬৮ "	২য় "	" উচু	" উঁচু।

পাগলের ঝুলি

বা

ধর্ম্ম-রাজ্যের খাঁটি কথা।

প্রথম রাত্রি।

এক পরমেশ্বরই সকলের প্রকৃত উপাস্য।

—:)*(:—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৯।২৪।

অন্য দেবতার আরাধনারূপ যজ্ঞসকলেরও স্বামী এবং ফলদাতা আমিই, ইহা ভেদদর্শী সাধকেরা যথার্থরূপে জানে না বলিয়াই তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ এ সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। (যাহারা সকল দেবতার মধ্যে অন্তর্যামিরূপে একমাত্র আমাকেই দেখে তাহাদিগকে আর সেরূপ করিতে হয় না, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।)

হরিপুর গ্রামে বহুদিন যাবৎ একটা পাগল আছে। সে কারো সঙ্গে কোন কথা বলে না, আপন মনে আপনি ঘুরে বেড়ায়; ক্ষুধা হ'লে কারো বাড়ী গিয়ে পেটে হাত বুলিয়ে ইসারা করে। ওখানকার লোকেরা তার ইসারা, অনেক দিন ধ'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে, এখন বেশ বুঝ্‌তে পারে। তাই ওরকম ইসারা কর্‌লে, গৃহস্থ ঘরে যা' থাকে কিছু খেতে দেয়, সেও খেয়ে আপন খুসি মত একদিকে চ'লে যায়। তার রাত্রে

ঘুমাবারও যায়গার ঠিক নাই ; কোন দিন গাছতলায়, কোন দিন মাঠের মধ্যে, কোন দিন বা কারো বাহিরের ঘরের বারান্দায় মাটিতে বেশ শুয়ে আছে, দেখা যায়। মুখখানা বেশ শান্ত, গম্ভীর। কি নাম, কোন্ জাতি, কোথায় বাড়ী কেউ জানে না।

ঐ গ্রামে কেশবদাস নামে এক বুড়ো বৈরাগীর বাস। লোকটা বেশ সরল, তার কথাগুলো ভারী মিষ্ট। সে কোনদিন কারো অনিষ্ট ক'রেছে কি কারো মনে ব্যথা দিয়েছে, এ কথা কেউ ব'লতে পারবে না ; বরং গরীব হ'লেও, তার যতটুকু ক্ষমতা, সে ততটুকুন উপকারই লোকের ক'রে থাকে। কারো মনে কোন শোক তাপ হ'লে, যদি সে জানতে পারে, তবে তার কাছে গিয়ে, যতটা তার বুদ্ধিতে যোগায় সেই ভাবে তাকে প্রবোধ দিবে ; ক্ষুধায় ভারী কাতর হ'য়েছে এমন কাউকে দেখ্তে পেলে, নিজের ঘরে যদি কিছু থাকে, তাকে আদর ক'রে খাওয়াবে, না থাকলে একজনের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তার খাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। কারো অসুখ হ'য়েছে শুনতে পেলে সে তখনি তাকে দেখ্তে যাবে, দরকার হ'লে তার সেবাও করবে। সেই গ্রামে বা গ্রামের আশে পাশে অনেক যায়গার লোকই তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। কেউ যদি নিজের অবসর সময় তাকে পায়, তবে ধর্ম্ম বিষয়ে নানা কথা তাকে জিজ্ঞাসা বাদ করে, সেও তার যতটা জানা আছে উত্তর করে ; আর যদি জানা না থাকে কি বুঝে উঠ্তে না পারে, তবে বলে, "বাবা, এর জবাব আমি দিতে পারবো না, এ ঘটে গুরু কিছু যোটাচ্ছেন না।"

এই কেশব বাবাজির আখ্ড়ায় ঐ পাগল মাঝে মাঝে যায়, খায় এবং কোন কোন দিন তার শোবার ঘরের বারান্দায় ঘুমায়। এই দেখে লোকের ধারণা যে, পাগল কেশবকে ভালবাসে। কেশবেরও সেই ভাবের ধারণা ক্রমে ঘনিয়ে উঠ্তে লাগ্ল। কেশব পাগলকে নিজের আখ্ড়াতে পেলেই খুব আদর যত্ন ক'রবার চেষ্টা করে, কিন্তু পাগল ত কথা কবে না,

আর কোন কিছুর ধারও ধারে না, কাজেই কেশব কিছুতেই তাকে বাগা'বার সুবিধা ক'র্‌তে পার্‌ছে না। সে কোন দিন হয় ত ভাল যায়গায় আসন দিয়ে, থালায় ক'রে খাবার দিল, পাগল থালাখানা আঙ্গিনায় নামিয়ে নিয়ে, হয়ত খাবার জিনিষগুলো মাটিতে ঢেলে, খেয়ে চ'লে গেল। কেশবও ছাড়্‌বার লোক নয়। ওকে আর পাগল ব'লে তার মনে হয় না, মহাপুরুষ ব'লে ক্রমেই বিশ্বাস হ'চ্ছে; সে কথা কাউকে বলে না বটে, কিন্তু পাগলের কাছে ক্রমেই সে ভক্তিতে গ'লে নত হ'য়ে প'ড়্‌ছে।

কিছুদিন এমনি ভাবে যায়। একদিন কেশবদাস বাবাজি রাত্রে ঘরে ঘুমিয়ে আছে। রাত্রি তখন দুটা আড়াইটা হবে। গাঁয়ের সবাই ঘুমিয়ে প'ড়েছে। পাগল হঠাৎ এসে ডাক্‌ছে, "কেশব, ওঠ্, ওঠ্, আমি আস্‌ছি। আয়, আমার কাছে আয়।" কেশব বাবাজি আওয়াজ শুনে চম্‌কে উঠ্‌ল। তার শরীরের ভিতর দিয়ে যেন একটা তাড়িতের খেলা হ'য়ে গেল, গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে সে বিছানায় ব'সে ভাব্‌ছে, এমন সময় বারান্দায় আবার শুন্‌ল, "কেশবরে, দরজা খোল্, আয়, আমার কাছে আয়।" বাবাজি এবার ব'ল্‌ল, "এত রাত্রে আপনি কে?" উত্তর হ'ল, "আমি তোর সেই পাগল।" আনন্দে টলমল হ'য়ে, টল্‌তে টল্‌তে বাহিরে এসে, বাবাজি পাগলের পা দুখানি জড়িয়ে ধ'রে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল; কিছুই ব'ল্‌তে পার্‌ছে না। কতকালের সাধনার পর যেন আজ পরম রতন পেয়ে, তার হৃদয়ে আনন্দের ভরা বন্যা ঢেউ খেলে চ'লেছে। পাগল কেশবের হাত ধ'রে তুলে ব'ল্‌ল, "বাপ, স্থির হ', শান্ত হ'। আমি ত এসেছি, কি চাস্, বল্।" কেশব কতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কান্নার সুরে বল্‌ল, "কি ব'ল্‌ব, বাপ? তোমার মত দেবতাকে হাতে পেয়ে কি যে চাইতে হয়, তা আমি জানি না।"

পাগল।—(স্নেহভরে) তোর কিছু ভাবনা নাই, বাপ। তুই ত আমাতে আত্মসমর্পণ ক'রেছিস্, আমিও তোর হ'য়েছি। তোর যা জান্‌বার দরকার হয়, জিজ্ঞাসা করিস্। তোর যতটা নেবার ক্ষমতা আছে, তাই বুঝে আমি তোকে উত্তর দিব। মাঝে মাঝে এমনি গভীর রাত্রে আমি আস্‌ব, তোতে আমাতে কথা হবে। সাবধান, আমি যে তোকে উপদেশ দিচ্ছি, এ কথা কাউকে জানা'স্ না—আমি যতদিন এ দেশে থাকি।

কেশব।—আমি মূর্খ মানুষ। একটু একটু লেখাপড়া যা জানি, সেটা লেখাপড়ার সামিল নয়। শাস্ত্র টাস্ত্রও বড় কিছু দেখি নাই। যা'ও বা দেখেছি, তারও সব যায়গা বুঝি না। সংস্কৃত ত মোটেই জানি না। কাজেই আমি যা যা ধারণা ক'র্‌তে পারি, তাই সোজা কথায় দয়া ক'রে ব'ল্‌বেন। আমি আর কি জানতে চাইব? ধর্ম্মতত্ত্ব একটু ভাল ক'রে জানিয়ে আমার প্রাণের পিপাসা মিটান, এই প্রার্থনা। এ পোড়া জীবনে ত কিছুই হ'লো না।

পাগল।—তাই হবে। এখন কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌বি, কর্।

কেশব।—আপনার দয়ায় সকলেই আমাকে একটু স্নেহ করে। সেই জন্য তারা অনেক সময় ধর্ম্ম কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে থাকে। আপনার চরণ-কৃপায় আমি যেটুকু জানি বা যা বুঝি, তাই তা'দিগকে ব'লে থাকি, তা'রাও তাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকে। তবে সব চাইতে মুস্কিল দুই একজন হাল ফেশানের বাবুকে নিয়ে। বুড়োর মধ্যেও দুই একজন আছে, তারা সময় সময় এমন সব কথা জিজ্ঞাসা করে, যার জবাব দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়। সে সব কথা শুনে, সময় সময় আমার নিজেরই সন্দেহ এসে যায়। যাই হোক, ভগবানের কৃপায় যখন আপনাকে পেয়েছি, তখন সেই সব ধাঁধাঁ মিটিয়ে নেবারি চেষ্টা ক'র্‌ব।

পাগল।—আরে বাপু, অত বক্তৃতা করিস্ কেন? যা ব'ল্‌বার

হয়, সোজাসুজি ব'লে ফেল্‌না।

কেশব।—আজ্ঞে হাঁ, তাই বলি। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। হিন্দুরা সকল দেবতারই পূজা করে। তা হ'লে তাদের ঈশ্বর এক নয়, অনেক, এই সন্দেহ অনেকে করে। আবার একথাও তাদের শাস্ত্রে শুনা যায়, ভগবান্ এক, দুইজন ভগবান্ নাই। এখন এই দুই রকম কথার মিল কি ক'রে করা যায়? আমি ত বলি, যে কালী সেই কৃষ্ণ, সেই শিব, সেই সূর্য্য, কাজেই এক ভগবান্। তা ত অনেকে মান্‌তে চায় না। তারা বলে, দেখ্‌ছি অনেক, তবুও এক বল কি ক'রে? আর, এক দেবতার সঙ্গে আর এক দেবতার চেহারার মিল নাই, নামেও মিল নাই; কেউ পুরুষ, কেউ স্ত্রী। এসব আপত্তির যে জবাব দেই, সে ক্ষমতা আমার নাই। তবে আমি সবই সেই এক ভগবান্ ব'লে বিশ্বাস করি ও ভক্তি করি।

পাগল।—বেশ কথা ব'লেছ। অনেককাল হ'ল দেশে এই নিয়ে নানা দলের মধ্যে বিবাদ চ'ল্‌ছে, অনেকেই নিজের নিজের মতটাকে বড় বলে, আর অন্যের উপাস্য দেবতাকে উড়িয়ে দিতে চায় এবং ঘৃণা করে। যারা এসব নিয়ে ঝগড়া করে, তাদের শাস্ত্র ভাল ক'রে দেখ্‌বার প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা নাই; আর সাচ্চা সাধুর কাছে বা ধার্ম্মিক লোকের কাছেও তারা এসব কথা শুন্‌তে বা জান্‌তে যায় না। কপট লোকের বাহিরের চটক দেখে উপদেশ নিতে যায়, ফলও তেমনি হয়।

ভগবান্ সব জায়গায় আছেন, যারা এ কথা মুখে বলে, তারা যদি এ কথা বিশ্বাস করে, কি অন্ততঃ শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেয়, তবে ঐ বিষয় বুঝা'তে বেশী কষ্ট হয় না। ঐ ভাবটাকে না ধ'র্‌লে এর মীমাংসা হওয়া বড় কঠিন। যারা ভগবান্‌কে নিজ মনের মত গ'ড়ে একটা যায়গায় আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে চায়, অন্য কথায় কাণ দিতে চায় না, তা'দিগকে একথা বুঝা'তে যাওয়া বৃথা। এখন তুমি নিজে ভাল ক'রে

বুঝ্‌বার চেষ্টা কর দেখি। 'সবই এক' এ কথা মুখে ব'লে, মনে মনে একটা বিশ্বাস রাখ্‌লেই হ'য়ে গেল না। কথাটা যদি যুক্তির উপরে দাঁড় করান যায়, তা হ'লে আর কোন দিন সন্দেহ আস্‌তে পারে না। যতদূর সম্ভব তাই করা উচিত। যে কথার পেছনে বিশেষ কোন যুক্তি নাই, সে কথার বিরুদ্ধে জোর ক'রে কেউ কিছু ব'ল্‌লে বা যুক্তি দেখালে, আগের বিশ্বাস ট'লে যেতে বেশীক্ষণ লাগে না।

আচ্ছা, ভগবান্ কোথায় আছেন ব'লে তুমি মনে কর?

কেশব।—আজ্ঞে, তিনি কোথায় নাই? তিনি ত সব যায়গায়ই আছেন। তিনি ত সকলের আত্মা-রূপে আছেন, শুনি। তিনি যদি সব যায়গায় না থাকেন, তবে ত কেউ বাঁচ্‌তেই পারে না। এই ত সে দিন গোসাঞি ও বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'র্‌ছিলেন। সেখান থেকে এ কথা বেশ ক'রে শুনে রেখেছি। ব্রহ্মা যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখা সকল ও গাই বাছুরগুলো সব হরণ ক'রে নিয়ে, গিরি গোবর্দ্ধনের গুহার ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেই সময়ে ভগবান্ নিজেই রাখাল গরু বাছুর সব হ'য়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সব নিয়ে গোষ্ঠ লীলা ক'র্‌তেন। এক বৎসর এমনি গেলে, ব্রহ্মার ভুল ভাঙ্গ্‌ল। এই এক বৎসর গোপিনী মায়েরা আপন আপন ছেলেকে আগের চেয়ে বেশী ভাল বাস্‌তেন, আর গাইগুলো তাদের বাছুরগুলোকে আগের চেয়ে বেশী ভাল বেসেছিল। তাই, মহারাজ পরীক্ষিৎ এর কারণ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, শুকদেব গোস্বামী স্পষ্টই ব'ল্‌লেন, 'দেখ, মানুষ যতই বলুক না কেন যে, ছেলেকে বা স্ত্রীকে বা অপর কাউকে সে খুব বেশী ভাল বাসে, কিন্তু তথাপি এটা ঠিক জান্‌বে যে, নিজের প্রাণের চেয়ে কেউ কাউকে বেশী ভাল বাসে না। দেখ, মানুষের যখন ভারী ব্যারাম হয়, তখন সে টাকা পয়সা স্ত্রী পুত্র কারুর জন্যই তেমন ভাবে না, যেমনটা নাকি নিজের ভাল হবার জন্য ভাবে। আবার যখন ব্যারামে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে যায়, হয় ত

কোন কোন অঙ্গ অবশ বা নষ্ট হ'য়ে যায়, তখনও সে ভাবে, যাক্, ওগুলো গিয়েও আমার প্রাণটা থাক। এ সময় তাদের দেহের চেয়েও প্রাণটার উপরই বেশী মমতা দেখা যায়। আর, এই যে লোকে অন্যকে ভালবাসে, তাও নিজের প্রাণের তৃপ্তির জন্যই। কাজেই, একথা খাঁটি সত্য যে, প্রাণ বা আত্মাই প্রকৃত ভালবাসার জিনিস। আর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রাণের প্রাণ, আত্মা। তবে তিনি জগতের হিতের নিমিত্তই নিজ মায়াতে দেহধারীর মত দেখাচ্ছিলেন, সেই কৃষ্ণই যখন রাখাল ও বাছুর হ'য়েছিলেন, তখন তাদের মায়েরা তাদেরে বেশী ভাল না বেশে পারে নাই।' এ সব কথা শুন্‌লে কে না বিশ্বাস ক'র্‌বে যে, ভগবান্ সব যায়গায়ই আছেন, সকলের মধ্যেই আত্মারূপে আছেন?

পাগল।—বেশ্, তুমি নিজেই যে প্রমাণ উপস্থিত ক'র্‌লে, তাতে ব্যাপারখানা অনেক সোজা হ'য়ে গেল। তুমি সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় প'ড়েছ :—

উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥

কেশব।—আজ্ঞে হাঁ, এখন মনে প'ড়্‌ছে, ভুলে গিয়েছিলাম।

পাগল।—এখন গোটাকত দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে আরো খোলাসা করি। শোবার সময় তোমরা বালিশ ব্যবহার কর। বালিশের উপরের খোল নানা রঙ্গের হয়, বালিশের চেহারাও ছোট বড় গোল চেপ্টা নানা রকমের হয়, কিন্তু ঐ খোল ছিঁড়ে ফেল্লে, ভিতর থেকে কি বেরোয়? কেবল তুলা, সাদা তুলা। শাস্ত্রে গাইয়ের দুধের দৃষ্টান্তও আছে। গাই যে কোন চেহারার বা যে কোন রঙ্গেরই হোক্, তার দুধ সাদাই হবে। তেমনি আমাদের শরীরটা যেন খোলস,—মানুষ খোলস, পশু খোলস, পক্ষী খোলস ইত্যাদি—তা যদি ছেঁড়া যায় অর্থাৎ ভিতরের দিকে যদি লক্ষ্য করা যায়, তবে ভিতরে কেবল সেই এক আত্মাই পাওয়া

যাবে। খোলসের মধ্যে যে জিনিসটী আছে, সেটা সব যায়গায়ই এক, তবু বাহিরের অমিল দেখে আমরা মারামারি করি। একটু ভাল ক'রে বুঝে দেখ্‌লে, যাদের মধ্যে কোন মিল নাই ব'লে আগে বুঝেছি, তাদের মধ্যে বেশ মিল দেখা যায়। মানুষ পশু পাখী স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে যে কথা বলা গেল, ঐটা এখন হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার উপরে খাটাও দেখি। ঐটা খাটা'তে পার্‌লেই সকল গোল চুকে যায়। ভগবান্‌ নিজ মুখে গীতায় অর্জ্জুনকে ঐ কথাই ব'লেছেন। তিনি ব'লেছেন, সকল দেবদেবীই আমার শরীর, আমি তাদের মধ্যে আত্মারূপে আছি। যারা তা' না বুঝে ঐ সকলকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ মনে করে, তারা আমাকে পায় না, কাজেই পরম শান্তি পেতে পারে না।

কেশব।—এ ত এখন বেশ বুঝ্‌লাম ব'লে মনে হ'চ্ছে, কিন্তু তবু যেন পুরাপুরি বুঝা হ'ল না ব'লে মনে হয়। নিজে একবার অনুভব ক'র্‌তে পার্‌লে যেন বেশ পরিষ্কার হ'ত, খুব আনন্দ হ'ত।

পাগল।—ঠিক ব'লেছিস্‌। দেখ্‌ কেশব, মুখে যতই বলিস্‌ না কেন, নিজকে যতক্ষণ না চিন্‌তে পার্‌বি, নিজের ভিতর কি একটা আছে যার বলে চ'ল্‌তে ফির্‌তে, ব'ল্‌তে কইতে, ভাব্‌তে চিন্তিতে পার্‌ছিস্‌, তা যতদিন না দেখ্‌বি, ততদিন মনের ধাঁধাঁ ঠিক ঠিক ঘুচ্‌বে না, ভগবান্‌কেও চিন্‌বি না এবং প্রকৃত শান্তিও পাবি না।

কেশব।—তবে কি ক'র্‌ব, বাবা? কি ক'র্‌লে সেটা হয়?

পাগল।—তোর ভিতর যে পরম গুরু র'য়েছেন, তিনি যখন তোর সুবুদ্ধি যুটিয়ে দিয়েছেন, তখন ত আর কোন ভাবনা দেখি না। তুই একবার ঠিক হ'য়ে, সোজা হ'য়ে, আমার চোখে চোখে চেয়ে ব'স্‌ দেখি। মনটা খালি ক'রে ফেল্‌, কোন কিছু ভাব্‌বি না, কেবল আমার চোখে চোখে চেয়ে থাক্‌বি, পলক ফেল্‌বি না। যতক্ষণ কিছু না বলি, ততক্ষণ এমনি ক'রে চেয়ে থাক্‌বি, নড়্‌বি চড়্‌বি না।

কেশব তাই ক'র্‌ল। এ ভাবে কখন থাকা অভ্যাস নাই, তাই তার একটু কষ্ট হ'চ্ছিল, কিন্তু তথাপি সে সেই ভাবে অনেকক্ষণ থাক্‌ল। শেষে তার বাহ্য জ্ঞান যেন কিছু ক'মে আস্‌তে লাগ্‌ল। তখন পাগল ব'ল্‌ল 'এখন একবার তোর ভিতরে ভাল ক'রে খেয়াল কর্‌. তোর শ্বাস প্রশ্বাসের গতির প্রতি লক্ষ্য কর্‌ দেখি।' কেশব লক্ষ্য ক'র্‌তে লাগ্‌ল। কতক্ষণ পর পাগল ব'ল্‌ল, 'দেখ্‌লি কি ?'

কেশব।—আজ্ঞে হাঁ, দেখ্‌লাম।

পাগল।—কিছু অনুভব ক'র্‌তে পার্‌লি কি ?

কেশব যা যা অনুভব ক'রেছিল, সবই তাকে ব'ল্‌ল। পাগল তখন কেশবের নিকটে এগিয়ে অতি অনুচ্চস্বরে কতকগুলি সঙ্কেত তাকে ব'লে দিল ও জিনিসটা, কিছু কিছু প্রমাণ দিয়ে এবং যুক্তি দিয়ে, বুঝিয়ে দিল। অবশেষে পাগল তাকে ব'ল্‌ল, "আচ্ছা, ঐ ভাবে কিছুক্ষণ কাজ কর্‌ যতক্ষণ আমি তোকে না ডাকি।"

কেশব পাগলের কথামত কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ক্রমে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে প'ড়্‌ল। তার মুখখানি খুব শান্ত ও আনন্দময় দেখা যেতে লাগ্‌ল। কতক্ষণ পর পাগল ডাক্‌ল, "কেশব! কেশব!" কেশব নীরব, কারণ তার বাহিরের জ্ঞান কিছুই নাই, সে যেন সুখে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। পাগল কেশবের মাথায় ও পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলা'তে বুলা'তে ডাক্‌ল, "কেশব! কেশব!" এইবার কেশব আস্তে আস্তে চোখ মে'ল্‌ল।

পাগল।—কি হ'য়েছিল রে ?

কেশব।—(ধীরে ধীরে) আজ্ঞে, তা জানি না। জগতের সব ভুলে গিয়েছিলাম, এই দেহটা ছিল কি না, তাও জানি না। কি এক অজানা অবস্থায় ডুবে গিয়েছিলাম! বড় আনন্দ! বড় আনন্দ! এমন আনন্দ ত জীবনে কখনো পাই নাই।

পাগল।—বেশ! তোর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা করা ছিল, তাই এই উচ্চ অবস্থা এত সহজে অনুভব ক'র্‌তে পার্‌লি। এখন বুঝ্‌লি তুই কে?

কেশব।—আজ্ঞে, এই ত এখানে ব'সে আছি।

পাগল।—আরে মূর্খ, এতক্ষণও বুঝ্‌লি না। আচ্ছা, বল দেখি, শরীরের জ্ঞান চ'লে যাওয়া পর্য্যন্ত যে জিনিসটা খেয়াল ক'র্‌ছিলি, মরা মানুষের কি সেটা থাকে?

কেশব।—আজ্ঞে, না। এখন বেশ বুঝেছি। অনেক লোককে ম'র্‌তে দেখেছি। তাদের মরার পর দেখেছি, দেহের সবই থাকে, কেবল ঐ জিনিসটাই থাকে না। হাত পা চোখ মুখ সহ সমস্ত দেহটাই থাকে, তথাপি আত্মীয় স্বজনেরা কাঁদে, 'হায়রে অমুক কোথায় গেল! আর তার দেখা পাব না!'

পাগল।—হাঁ, এখন বুঝ্‌লি ঐটীই হ'চ্ছে আসল মানুষ। এর মধ্যে আরও অনেক কথা ব'ল্‌বার আছে, তবে তা এখন তোকে ব'লব না, যদি পরে দরকার বুঝি, সময় মত বলা যাবে। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লি, মেয়ে মানুষ পুরুষ মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের মধ্যে আসল জিনিস কোন্‌টা?

কেশব।—আজ্ঞে, এখন বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, ঐ একটা জিনিসই সবার মধ্যে আছে, দেহগুলো খোলস মাত্র। দেব দেবীর পূজার সম্বন্ধে একজন সাধক আমাকে অনেকগুলি কথা ব'লেছিলেন, তখন সে সব বুঝ্‌তে পারি নাই। এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, দেব-দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'চ্ছে পূজকের নিজের ভিতরের ঐ জিনিসটীই সাম্‌নে দেব-দেবীর যে মূর্ত্তি থাকে তার ভিতরে আরোপ করা। পূজা তাঁরই হয়, দেব-দেবীর মূর্ত্তি যা দেখি, তা সেই জিনিসটীরই আধার মাত্র। আবার যে যাঁর উপাসক, সে তাঁকে স্তব ক'র্‌বার সময় বলে,—'তুমিই জগতের একমাত্র

উপাস্য, একমাত্র তুমিই আদিতে ছিলে, তোমার আদি কেউ নেই, সব লয় হ'য়ে গেলে একমাত্র তুমিই থাক্‌বে, আর এখনও সকল জীবে আত্মা-রূপে তুমিই আছ।' এতে বেশ প্রমাণ হয় যে, লোকে যে নামেই ডাকুক না কেন, আর যতরূপেই দেখুক না কেন, সকলেরই উপাস্য সেই এক জনই।

পাগল।—হঁা, তাই বটে। বেশ ব'লেছ। বড় বড় সাধক-দের মুখে একটা গান শোনা যায়। সেই গানটা তোমাকে বলি, তার মধ্যে তুমি সংক্ষেপে খাঁটি কথাগুলো পাবে :—

সংসারে পরমারাধ্য সেই সে একজনা।
সে যে চিন্ময় সচ্চিদানন্দ, তারে কেউ চিনে কেউ চিনে না॥
সে যে নিরাকার বহুরূপী, দৃশ্য নয় সে সর্ব্বব্যাপী, কা'র বা আলাপী ;
ভেবে পাই না যে কূল, সূক্ষ্ম কি স্থূল, আদি মূল তার মিলে না॥
চরণ নাই চলিতে দক্ষ, নয়ন নাই সে করে লক্ষ্য, স্থূলাদি সূক্ষ্ম,
বদন নাই সে বলে বাক্য, অলক্ষ্য তার নিশানা॥
তারে বৈষ্ণবে কয় বিষ্ণু হরি, শৈবে কয় শিব জটাধারী,
শাক্তে শঙ্করী,
সে যে পুরুষ কি নারী, চিন্‌তে নারি, কোন যুক্তি শাস্ত্রে মিলে না॥
তার ধাম জানি না নামটী গুরু, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু, অতি সুচারু,
সেই গুরু ছেড়ে যে অন্যে ভজে, তার এ কুল ও কুল মিলে না॥

তিনি নিরাকার, কিন্তু সাধকের হিতের জন্য অথবা ভক্তকে কৃতার্থ ক'র্‌বার নিমিত্ত তিনিই সাকার হন; যেভক্ত যে নামে তাঁকে ডেকে আনন্দ পায় তিনি সেই নামেই সাড়া দেন ; যে ভক্তের হৃদয়ের ছাঁচ যেমন তার হৃদয়ে সেই ছাঁচেই তিনি ফুটে উঠেন ; তাঁর স্বরূপ কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—তার ধারণা ক'র্‌তে গিয়ে মনও আপনি ডুবে যায় ; তিনি সাক্ষী মাত্র, নিজে কিছু করেন না, কিন্তু অনন্ত বিশ্বে যা কিছু

হ'চ্ছে, তাঁকে ছেড়ে তার কিছুই হবার উপায় নাই, কাজেই তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা; এই সব বিরুদ্ধ ভাব একমাত্র তাঁতেই সমন্বয় লাভ ক'রেছে, তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়; একমাত্র তিনিই সকলের চরম উপাস্য। আর তোমাদের সম্প্রদায়ে যে একটা কথা আছে, 'গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে. সে পাপী নরকে মজে', তার ব্যাখ্যা এই গানের শেষ অন্তরার মধ্যে পাবে।

কেশব।—আঃ কি আনন্দ! আমার যদি হাজারখানা মুখ থাকৃত তা হ'লেও আমি আপনার দয়ার কথা ব'লে শেষ ক'র্‌তে পার্‌তেম না। আপনার এই সব কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে হ'চ্ছে আমি যেন কোন্ দেবপুরীতে আছি, কাণে অমৃত-ধারা প্রবেশ ক'র্‌ছে. হৃদয়-প্রাণ সুশীতল হ'য়ে যাচ্ছে! আপনার মুখে শুনে আজ আমার মনে প'ড়্‌ছে, অনেক দিন আগে ৺গোপীনাথজির নাট-মন্দিরে একজন সাধু. ভাবে মেতে, এই গান গেয়েছিলেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল প'ড়্‌ছিল; কেউ তাঁকে বড় গ্রাহ্য ক'র্‌ল না। একবেলা তিনি ছিলেন. দুটো প্রসাদ পেয়েই অন্যত্র চ'লে গেলেন। আমিও ওসব কিছু বুঝ্‌তাম না, কেবল বিশ্বাস ক'র্‌তাম, যে কৃষ্ণ সেই কালী সেই শিব সেই দুর্গা, সবই এক। আজ আপনি নিজগুণে কৃপা ক'রে আমাকে যা বুঝিয়েছেন, আমার হৃদয়-মন্দিরে যে জ্ঞানের বাতি জ্বেলে দিয়েছেন. তার শীতল ও উজ্জ্বল আলোকে সব যেন পরিষ্কার দেখ্‌ছি! মরি, মরি! কি আনন্দ!

এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কৃতজ্ঞতায় গ'লে, কেশব গুরুদেবের চরণ-ধূলি নিয়ে একটু খেল, আর বাকীটুকু বুকে ও কপালে মাখ্‌তে লাগ্‌ল।

পাগল।—বেশ, বাবা। বড়ই সুখী হ'লাম। আত্মা-গুরু কৃপা ক'রে তোমার হৃদয়ের গাঁ'টগুলো ভেঙ্গে দিয়েছেন। তোমার বড়ই সৌভাগ্য। আচ্ছা, আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে চাও, বাবা?

কেশব।—বাবা, আর ত কিছুই আমার দরকার দেখি না

আপনি অধম-তারণ, তাই অন্য লোকের জন্য আর একটা কথা আজ জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হ'চ্ছে। হিন্দুদের মধ্যে যারা দেব-দেবীর মূর্ত্তি গ'ড়ে, তার মধ্যে দেবতার পূজা আরাধনা করে, তা'দিগকে অনেকেই পৌত্তলিক ব'লে নিন্দা করে। এটা কি ঠিক ?

পাগল।—এ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তোলা যায় ও খণ্ডন করা যায়। সে সব না ক'রে, সোজা ভাবে তোমাকে কথাটা ধরিয়ে দিবার চেষ্টা ক'র্‌ছি।

তুমি ত দেখেছ প্রতিমার গড়ন প্রভৃতি শেষ হ'লে অর্থাৎ রং ফিরান আদি হ'য়ে গেলে, অমনি লোকে সেই প্রতিমার পূজা করে না. প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হ'লে পূজা হয় না। আর মন্ত্র পাঠ ক'রে বিধানমত বিসর্জ্জন-ক্রিয়া শেষ ক'র্‌লে. ঐ প্রতিমা তার পর যতদিনই সেখানে থাকুক না কেন, কেহই আর তার পূজা আরতি করে না বা সেখানে ভোগও দেয় না। তবে অবশ্য চিরদিনের জন্য যে প্রতিমায় দেবতার আবাহন বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে এবং যার বিসর্জ্জন-ক্রিয়া হয় নাই, সে প্রতিমা অবলম্বন ক'রে চিরকালই প্রতিদিন পূজা আদি হ'য়ে থাকে। এখন দেখ, পূজা কোন্‌টার হয়, মূর্ত্তিটার. না আর কিছুর ?

কেশব।—আজ্ঞে, আমি ত এটা বেশ বুঝ্‌ছি, কেননা এ বিষয়টা অনেক দিন থেকে লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি। তার পরে আপনার কৃপা হবার পর আমার আর একটুও সন্দেহ নাই। তবুও, লোকে হিন্দুদিগকে প্রতিমা-পূজক বা পৌত্তলিক ব'লে কটাক্ষ ক'র্‌তে ছাড়ে না, অনেকে নিন্দা এবং ঘৃণাও ক'রে থাকে. সেই জন্যই ব'ল্‌ছি।

পাগল।—যারা দেখ্‌বে না, শুন্‌বে না, ভাব্‌বে না ; দেখে শুনেও বুঝ্‌তে পার্‌বে না বা বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌বে না ; অথবা বুঝ্‌তে পেরেও কোন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য জিনিসটা মিথ্যা ভাবে প্রকাশ ক'র্‌বে, তাদের কথার মূল্য কি আছে ? তাই ব'ল্‌ছি. এ ব্যাপারটা যা তোমাকে

ব'ল্লাম, সেটা এত সহজ যে, সাধারণ মোটা বুদ্ধির লোকও একটু চিন্তা ক'র্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পারে। এ অবস্থায়, যারা নিন্দা ক'রে বেড়ায় তাদের বুদ্ধির সুখ্যাতি কে ক'র্‌বে? তবে সত্যের খাতিরে এ কথাটাও বলা এখানে খুব দরকার যে, যে সব লোক পূজা বা আরাধনা ক'র্‌তে গিয়ে ঐ প্রতিমাই যথা-সর্ব্বস্ব ভাবে, তার বেশী কিছু বুঝে না, তারা সত্যই পৌত্তলিক, কেননা এই অর্থেই গোড়ায় ও শব্দটা ব্যবহার হ'য়েছিল।

কেশব।—আজ্ঞে হাঁ। ব্যাপারটা তাই বটে।

"রাত্রি শেষ হ'য়ে আস্‌ছে। আজকার মত চ'ল্‌লাম"——এই ব'লে মহাপুরুষ তাড়াতাড়ি বাহির হ'য়ে গেলেন। কেশব সেইখানেই ব'সে ঐ সব কথা এক মনে ভাব্‌ছে। প্রভাত হ'য়েছে, পাখী ডাক্‌ছে। কেশব হঠাৎ আঙ্গিনার দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌ল, "রাত্রি প্রভাত হ'য়েছে। এখন যাই, হাত মুখ ধুয়ে এসে সাধনায় বসি।"

দ্বিতীয় রাত্রি।

সাধনার নানা আচারের কথা।

—:)*(:—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৭।২।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—দেহভিমানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ সত্ত্বগুণী, কেহ রজোগুণী কেহ বা তমোগুণী হয়, সুতরাং

তাহাদের শ্রদ্ধাও, যথাক্রমে, স্বভাবতঃই তিন প্রকার হয় অর্থাৎ সাত্বিকী রাজসী বা তামসী হয়।

প্রায় একমাস কেটে গিয়েছে, এর মধ্যে পাগল আর কেশবের আখড়ায় আসে নাই। মাঝখানে এক দিন সকাল বেলা, সাধনা শেষ ক'রে ঘর থেকে বাহির হবার সময়, কেশব দেখ্‌তে পেল, পাগল তাড়াতাড়ি তার আখড়ার সীমানার ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। কেশব তৎক্ষণাৎ সীমানার বাহিরে এসে এদিক ওদিকে চেয়ে কিছু দেখ্‌তে পেল না, কাজেই সে মনে ক'র্‌ল, "এ বুঝি আমার সৌভাগ্য, গুরুদেব বুঝি অধম সন্তানকে স্থক্ষ্মভাবে দেখা দিয়ে অন্তর্দ্ধান হ'লেন"।

এই ঘটনার কয়েক দিন পর একদিন গভীর রাত্রে পাগল এসে কেশবকে ডাক্‌ল। শব্দ কেশবের কাণে পৌছিবা মাত্র, কেশব আস্তে ব্যস্তে দরজা খুলে বাহির হ'ল এবং তাকে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে ব'স্‌তে আসন দিল। পাগল ক্রমান্বয়ে কতকগুলি প্রশ্ন ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌ল সে দিনকার বিষয় কেশবের বেশ একটু বোঝা হ'য়েছে কি না। কেশবের উত্তর সকল সন্তোষজনক হওয়াতে, পাগল ব'ল্‌ল—"বল্ এখন তোর আর কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার আছে।"

কেশব।—বাবা, কি ব'ল্‌ব, আমার ত আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ইচ্ছা হয় না। আমাকে যেন আমি হারিয়ে ফেল্‌ছি। আমার ইচ্ছা হয় সর্ব্বদা এই ভাবে ডুবে থাকি। যদি অন্য কিছু ভাব্‌তে হয় ত আপনার কথা ভাবি। যদি কিছু কাউকে ব'ল্‌তে হয়, তবে এই অমৃতের খবর যতটুকু আমি পেয়েছি, তাই বলি। কিন্তু সে কথা কেউ জিজ্ঞাসাও করে না, আবার নিজে যদি গায়ে প'ড়ে ব'ল্‌তে যাই, তাও শুন্‌তে চায় না। দুই এক কথা হ'তে না হ'তেই তাদের কথা তুলে বসে, আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে।

পাগল।—আরে, তা ত ক'র্‌বেই। যে যে রাজ্যে আছে সে সেই রাজ্যের কথাই ব'ল্‌বে, সেই রাজ্যের খবরই জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে। সংস্কারাবদ্ধ জীব যদি সরল প্রাণে সত্যের খোঁজ ক'র্‌তে থাকে, তবে এক দিন তার আত্মতত্ত্ব জান্‌বার ইচ্ছা হবে, তার আগে নয়। কাজেই যে যা জিজ্ঞাসা করে তার উত্তর দিয়ে, কিছু রহস্য বুঝাতে চেষ্টা ক'র্‌তে হয়। এমনি ক'র্‌লে তাদের কিছু কিছু ভ্রম দূর হ'তে থাক্‌বে। তা ছাড়া আর কি উপায় আছে, বাবা? সংসারে পৌণে ষোল আনা লোকই মায়ার জালের মধ্যে প'ড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কেশব।—সংসারের ছায়াবাজির খেলার কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ত আমার প্রাণে আর চায় না। তবে লোকে ধর্ম্মের সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন ক'রে বিরক্ত করে, তাই কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করি।

পাগল।—অজ্ঞানের জন্যই দুনিয়ার লোক শোক তাপ নানা রকম ভোগ ক'র্‌ছে। তাদের অজ্ঞান দূর ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লে ভগবানের একটা বড় রকমের সেবা করা হয়। কাজেই তাদের যে বিষয়ে ধাঁধাঁ আছে, তাই জিজ্ঞাসা কর্। এ সব জান্‌লে তোর হৃদয়ে অজানা ভাবে যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে, তাও চ'লে যাবে। এতে তোরও লাভ আছে।

কেশব।—ভগবান্ যখন এক, আর সকল লোকই সেই ভগবান্‌কেই পেতে চায়, তখন সকলে এক ভাবে অর্থাৎ একই নিয়মে সাধন ভজন করে না কেন? নানা রকম আচার, নানা রকম প্রথা দেখা যায়। কেউ বলে, নিরামিষ খাবে, স্ত্রীলোকের সঙ্গ ক'র্‌বে না, ঠাকুরদের নিরামিষ ভোগ দিবে ইত্যাদি। আবার কেউ বলে, কলিযুগে তন্ত্রমতে সাধন ছাড়া সিদ্ধি হবে না, আর তন্ত্রমতে সাধন ক'র্‌তে হ'লে, মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চ মকারের ব্যবহার করা চাই। আবার কেউ বলে, পূজার জন্য ফুল তুলসী বেলপাতা চন্দন নৈবেদ্য, এ সব দিয়া

প্রয়োজন কি ? ভগবান্ কি এই সব নেন ? তিনি হ'চ্ছেন সূক্ষ্ম জ্ঞানময় আনন্দময়, তাঁকে ধ্যান ক'র্‌লেই হ'ল, ভক্তি ক'র্‌লেই হ'ল। কেউ বলে, একটা মূর্ত্তি না হ'লে তাঁকে ভজন করি কেমন ক'রে ? মূর্ত্তি না নিলে ভজন হয় না। আবার কেউ বলে, ঈশ্বরের কি কোন মূর্ত্তি আছে ? তিনি সর্ব্বব্যাপী, কাজেই তাঁর মূর্ত্তি কল্পনা করা পাপ। এ সব কথার মীমাংসা কি ?

পাগল।—হাঁ, এক নিশ্বাসে প্রশ্ন কম কর নাই। আচ্ছা, একটা একটা ক'রে জবাব দেই, শুন্‌তে থাক।

সাধারণতঃ এই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী-পুত্র বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেশ ঘরকন্না ক'র্‌ছে, খাবার প'রবার কোন কষ্ট নাই, এ ধরণের লোকের অনেকেই 'ঈশ্বর ঈশ্বর' ক'রে মাথা ঘামাবার বড় ধার ধারে না ; যদিও কিছু করে তাও হয় ত বাপ পিতামহ ক'র্‌ত ব'লে, না হয় দেশের বা গ্রামের পাঁচজনে করে ব'লে, লোক দেখান ভাবে করে, প্রাণের টানে নয়। ব্যারাম পীড়া হ'লে যখন ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়ে কোন ফল পাওয়া যায় না, জীবনের আশা আর থাকে না, হয় ত এমনি সময় ঈশ্বরকে ডাকে, 'প্রভু, রক্ষা কর। আর ত গতি নাই। তুমিই অগতির একমাত্র গতি।' হয় ত কেউ কিছু ঘুঁসেরও ব্যবস্থা করে, 'প্রভু, ছেলে যদি ভাল হয়, যদি বেঁচে থাকে, ছেলে ওজন ক'রে হরির লুট দিব।' অথবা বলে, 'মা কালী, আমার খোকারে ভাল কর, বাঁচিয়ে রাখ, খোকার বিয়ের সময় যোড়া পাঁঠা বলি দিয়ে তোমার পূজা ক'র্‌ব।' হয় ত কোন মামলায় ঠেকেছে, জেল হবে, মানস ক'র্‌ল, বিপদ কেটে গেলে ঐ রকম একটা পূজা দিবে। এই সব অবস্থায় ঈশ্বর বা ঈশ্বরীকে যে ডাকে সে প্রাণের টানেই ডাকে, কিন্তু এটা তাঁকে পাবার জন্য নয়, তাঁকে খুসি ক'রে, সংসারের বেড়ী কাট্‌বার জন্য নয়, কেবল উপস্থিত বিপদটা কাটিয়ে সংসারের সুখটা ভোগ করার জন্য। বিপদটা কেটে গেলে আর

ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর কথা মনে থাকে না ; বাস ! নাক মুখ গুঁজে আবার সংসারের সুখে মেতে গেল ! তবে অবশ্য ঘুঁসটার কথা ভুলে না, সময় মত, সুযোগ বুঝে দিয়ে ফেলে। এ রকম হরির লুট বা পূজা ত ভগবানের আরাধনা নয়, এ কেবল কোন রাজ-কর্ম্মচারীকে ঘুঁস দেওয়ার মত একটা কাজ। আর বাপ পিতামহ ক'রেছে বা দেশের পাঁচজনে করে ব'লে যে পূজা আদি করা, সেটাও কোনমতে বেগার শোধ দেওয়া, ওর সঙ্গে ভজন সাধনের সম্পর্ক নাই ব'ল্লেই হয়।

কেশব।—বাবা, এই রকমই যে পোণে ষোল আনা যায়গায় দেখি।

পাগল।—তাইত ব'ল্ছি, প্রায়ই এই প্রকার। তাই দেশে এত ঢাক-ঢোল খোল-করতাল বাজ্‌ছে তবু কারো কিছু হ'চ্ছে না। এখন শুন। আরও দুই রকমের লোক আছে। এক রকমের লোক ধর্ম্মের সাজ পোষাক নিয়ে লোক ঠকাবার ফাঁদ পাতে। যেমন, একজন দোকানদারি করে। লোকে তার কথা বিশ্বাস ক'র্‌বে ব'লে ফোঁটা তিলক কাটে, মুখে খুব 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' বলে, আর সুযোগ পেলেই কম জিনিস দিয়া বেশী দাম নেয়, না হয় কম দামের জিনিস দিয়া বেশী দাম নেয়—আর মুখে কত সাধুগিরি ফলায়, ধর্ম্ম-কথা কয়, যেন গ্রাহকে ঠকানের কথাটা মোটেই বুঝ্‌তে না পারে। একজনের হয় ত রোজগার করার ক্ষমতা নেই। সে সাধুর পোষাক প'র্‌ল আর ধর্ম্মের বুলি আওড়াতে লাগ্‌ল। লোকে তাকে সাধু ব'লে বেশ খাওয়ায়, পয়সা কড়িও দেয়, সে কিন্তু সুযোগ পেলে গৃহস্থের ঘরে চুরি ক'র্‌তেও ছাড়ে না ! বেশ দু পয়সা হয়। এমনি ক'রে দূর দেশ থেকে পয়সা এনে মাগ্‌ ছেলের ভরণ পোষণ করে। আবার হয় ত কোন লুচ্চা সাধু সেজেছে। কোন গৃহস্থ তাকে বিশ্বাস ভক্তি ক'রে বাড়ীতে যায়গা দিয়েছে, খেতে দেতে দিচ্ছে, সে কিন্তু গৃহস্থের বৌটীকে নিয়ে একদিন পলাতক। এই সব ভণ্ড লোকের অত্যাচারে এখন অনেকে প্রকৃত বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসীকেও

বিশ্বাস ক'র্তে চায় না ও পারে না। ”

আর এক রকমের লোক আছে, তারা কেবল সস্তা খোঁজে। চরিত্র সংশোধন করা, সৎপথে চলা, সাধন ভজন করা, এ সব কিছু ক'র্তে রাজি নয়। যারা এ সব ক'র্তে বলে তাদের কাছে তারা ঘেঁসেও না। যদি কেউ ব'ল্ল; “যা ইচ্ছা তাই কর, তাতে কি? হরি আমার পরম দয়াল, দিনান্তে একবার হরি ব'ল্লেই বিষ্ণু-লোকে স্থান পাবে” ; অথবা যদি কেউ বলে, “মা কালী কি দুর্গা বড় দয়াময়ী ; যা ইচ্ছা কর, কিন্তু দিনান্তে একবার মা ব'লে ডাক্‌লেই কৈলাশে স্থান পাবে” ; তা হ'লেই তারা তাকে ভারী দয়াল গুরু ব'লে মেনে নেয়, তা'রই শরণ লয়। আর যদি এরই সঙ্গে উপকরণ-রূপে একটু মদ্যপান, গঞ্জিকা সেবন, পর-নারী-গমনের ব্যবস্থা থাকে, তবে ত সোণায় সোহাগা। ‘এ ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সেরা’ ব'লে তারা বগল বাজায়। তবে এ লোকগুলো ঠকদের চেয়ে অনেক ভাল। ঠকগুলো কেবল পরের সর্ব্বনাশ করে এবং নিজের পায়ের নীচে ত খাল কাটেই ; আর এরা কেবল নিজেদেরই ফাঁকি দেয়, পরের সর্ব্বনাশ করার উদ্দেশ্য এদের তত নাই।

কেশব।—ঠিকই ব'ল্‌ছেন, বাবা। এমনি দুনিয়ার খেলা।

পাগল।—যারা ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ মানে, ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতি করার জন্য যারা সাধন ভজন করে, তাদের মধ্যে যে নানা মত ও নানা পথ দেখ, সেই কথা এখন ব'ল্‌ব। কিন্তু সে কথা বলার পূর্ব্বেই তোমাকে আর একটা কথা ব'লে নেই। এই সব লোক অল্প বিস্তর এটা বুঝেছে যে, সংসারের সুখ চিরদিন থাকে না। দুদিনেই সে সুখ শেষ হ'য়ে যায়, দুঃখ আবার আসে। সংসারে আস্‌লেই এই সুখ দুঃখের মধ্যে প'ড়্‌তে হয় ; জন্ম মৃত্যু ব্যাধি শোক কলহ ইত্যাদি লেগেই আছে। শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে স্থান লাভ না করা পর্য্যন্ত আর এ সব

যাবার নয়। তাই তারা নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে ভোগের বাসনা ত্যাগ ক'র্‌ছে এবং ইষ্ট দেবের আরাধনায় যথাসাধ্য চেষ্টা ক'র্‌ছে।

দরকার বড় বালাই, রে বাবা। যার যেমনটী দরকার সে ত তেমনটীই খুঁজ্‌বে। যাদের মোটা নজর, বুদ্ধিও মোটা, ঠেকে ঠেকে নানা যাতনা পেয়েও যাদের বিশেষ ক'রে ভাব্‌বার প্রবৃত্তি আসে না, তারা দুদিনের সংসারে দুদিনের জন্য হাসি-খুসি খাওয়া-দাওয়া লম্ফ-ঝম্ফ ছাড়া আর কিছু বোঝেও না, চায়ও না, কাজেই তাই খুঁজে বেড়ায়। আর নিজের চেষ্টায় সেটা না পেলে, তখন ভগবান্ বা ভগবতীর কাছে তাই চায়। এর বেশী যে কিছু আছে, সে কথা তাদের মাথায় আদৌ ঢোকেই না, তাই সে পথে যাবার চেষ্টাও তাদের নাই।

ভগবান্ বা ভগবতীকে পাওয়া যাদের একান্ত দরকার বোধ হয়, তা সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা বা শোক-তাপ পেয়েই হোক, আর যে জন্যই হোক, তারাই প্রকৃত সাধক। সব মানুষের রুচি এক রকমের নয়, সকল মানুষের জ্ঞানের পরিমাণও সমান নয়। দেখ, সংসার চালাবার জন্য সকলেরই টাকা উপায় ক'র্‌তে হয়, কিন্তু সকলেই কি এক রকম ব্যবসা করে? কেউ দোকানদারি করে, কেউ ডাক্তার হয়, কেউ কবিরাজ হয়, কেউ উকিল হয়, কেউ গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করে, কেউ জমিদার বা মহাজনের চাকুরি করে, কেউ চাষ করে, কেউ লোহার কামার হয়, কেউ সোনার কামার হয়—এ ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ। তার মধ্যে আবার দেখ একই ব্যবসা যারা করে, তাদের সকলের বুদ্ধির পরিমাণও এক নয় এবং কাজ করার সুবিধাও সকলের সমান যোটে না, সুতরাং টাকা উপায়ও সকলের সমান হয় না। আবার দেখ ঐ সকলের মধ্যে ভাল মন্দ দুই রকমেরই মানুষ আছে। কেউ বা ন্যায়-মতে সত্য পথে থেকে কাজ করে, কেউ বা নানা ছল চাতুরি ক'রে লোক ঠকায়। এই ঠকদের কথা বাদ দাও। তাদের কথা এই অল্প আগেই ব'লেছি। এখন

এই সংসারী জীবনের ভাবটা ধর্ম্ম-জীবনে খাটাও।

সাধকদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার গুণের লোকই আছে। সত্ত্বগুণ যাদের বেশী তারা ইন্দ্রিয়-সেবায় মোটেই যায় না, যশ-মান ধন-জন এ সকলের দিকেও তাদের খেয়াল নাই, তারা কেবল শান্ত-মনে পবিত্র-ভাবে ভগবানের আরাধনায় লেগে থাকে। রজোগুণ যাদের বেশী তারা হৈ চৈ ভালবাসে, মান-যশ-প্রতিপ্রত্তি ধন-জন এই সব খুব চায়। তাদের সাধনায় একটা ধুমধাম জঁাক-জমক থাকবেই; দম্ভ অহঙ্কারও থাকে। আর তমোগুণ যাদের বেশী তাদের আচার বিচার কিছু নাই, উৎসাহ উদ্যম খুবই কম, প্রাণটা হিংসা দ্বেষে ভরা; তারা অপবিত্র জিনিস দিয়ে অপবিত্র ভাবে পূজা আদি করে। আবার ঐ এক একটা গুণের কম বেশী অনুসারে ঐ সকল ভাবের ও কাজেরও কম বেশী হ'য়ে থাকে। এই যা সব ব'ল্লাম, এগুলো বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছ ত?

কেশব।—আজ্ঞে, হাঁ।

পাগল।—সকলেই যদিও একই ভগবান্‌কে পেতে চায় তথাপি ঐ সব কারণে একই ভাবে বা একই নিয়মে সাধন ভজন করে না বা ক'র্‌তে পারে না। লোকের প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা নানা ভাবের ব'লেই, সাধনায়ও নানাবিধ আচার ও নানাবিধ প্রথা দেখা যায়। যারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, ভগবানের দিকে যারা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, তাদের মন্দ বিষয় ভোগের পিপাসা থাক্‌তেই পারে না। তাই তারা নিরামিষ আহার করে, কেউ কেউ বা এক বেলা হবিষ্যান্ন করে, স্ত্রীলোক হ'তে দূরে থাকে, ঠাকুর দেবতার ভোগ দিতে হ'লে ভাল ভাল সাত্ত্বিক খাদ্য দিয়ে নৈবেদ্য ক'রে দেয়। যারা অত্যন্ত রাজসিক প্রকৃতির লোক, মদ্য মাংসাদিতে যাদের প্রবৃত্তি আছে, তাদেরই ঐ সব জিনিস দিয়ে পূজা ক'র্‌তে সাধ হয়। শুধু পূজা করা নয়, তারা পূজা-কালে বা পূজা-অন্তে

মহা আনন্দে ঐ সব জিনিস ব্যবহার করে সাধনারই অঙ্গ মনে করিয়া। এটাকে প্রবৃত্তি-মার্গের সাধনা বলে। এ ভাবে শাস্ত্রের আদেশ মেনে, যথারীতি পূজা ধ্যান জপ আদি ক'র্‌তে ক'র্‌তে কালে চিত্ত কিঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে সাধনার দিকেই মন বেশী যায়, ওগুলির দিকে দৃষ্টি কম হ'য়ে যায়, শেষে ওগুলির ব্যবহারে তাদের প্রবৃত্তি আর থাকে না। তখন তারা শুধু ধ্যান জপ এই সব নিয়েই থাকে। প্রবৃত্তি সংযত ভাবে থাক্‌তে থাক্‌তে নিবৃত্তিই এসে যায়। আগে যাদের কথা বলা হ'য়েছে তারা নিবৃত্তি-মার্গের সাধক। তাদের প্রথম প্রথম বাহিরে পূজার উপকরণ আদিতে (যদিও সাত্ত্বিক ভাবের হোক) নজর থাক্‌লেও, শীঘ্রই ও সকলের দিক হ'তে দৃষ্টি স'রে আসে। তারাও শেষে কেবল ইষ্ট দেবতার ধ্যান জপেই ম'জে যায়। এমনি ক'রে সাধক বাহিরের দিক থেকে ক্রমে ভিতরে ডুবে যায়। বাহিরের কাজগুলো হ'চ্ছে শুধু সাধকের চিত্ত-শুদ্ধির জন্য। চিত্ত যতই নির্ম্মল হবে, মন ততই অন্তর রাজ্যে ডুবে যাবে, ক্রমে সূক্ষ্ম তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছিবে। সাধকের মনটাকে সরল নির্ম্মল এবং সদা ভগবানের ভাবে ভাবিত করার উদ্দেশ্যেই, সাধকের অবস্থা বিবেচনায়, শাস্ত্রে নানা বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার, বিধি-নিষেধ—এ সকলের কথা বলা হ'য়েছে। যে ভাল হ'তে ইচ্ছা করে না ও চেষ্টা করে না, ভগবান্ শুধু তার বেশ পোষাক ইত্যাদিতে ভুলেন না।

কেশব।—তা হ'লে, আগেই যদি কেউ ঐ সব বাহিরের কাজ না ক'রে, শুধু ধ্যান নিয়েই থাকে, তবে কি ভাল হয় না?

পাগল।—পার্‌লে ত ভালই। মানুষ তা পারে কৈ? বাহিরের নানা ভোগের বিষয়ে যতক্ষণ টান থাকে, ততক্ষণ ত মন স্থির ক'রে ধ্যানই ক'র্‌তে পার্‌বে না। ঐ সব বাহ্য পূজাদির দ্বারা ভগবানের দিকে মন রাখ্‌তে রাখ্‌তে যখন ভোগের বাসনা খুব কমে যায়, তখন ধ্যান করার ক্ষমতা জন্মে। নচেৎ ধ্যান ক'র্‌তে ব'স্‌লেও বিষয়-সম্পত্তির, যশ-

মানের, ভোগ-বাসনার কথাই মনে এসে হাজির হয়, কাজেই চুপ ক'রে ব'সে থাকাই সার হয়, আসল কাজের কিছু হয় না। তাই সাধারণ লোকের পক্ষে বাহিরের পূজা কীর্ত্তন প্রভৃতির খুব দরকার আছে। তবে যদি কোন লোকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনার বলে মনের অবস্থা এমনি হয় যে, সহজে মন স্থির হয়, ধ্যানাদির সময় বাহিরের বিষয় আর মনে আসে না, তার পক্ষে বাহিরের ওগুলো করার আবশ্যক হয় না। ভগবান্ ঐ ফুল তুলসী শঙ্খ ঘণ্টা নৈবেদ্য ইত্যাদি না চাইলেও, প্রথম অবস্থায় মনকে বিষয়-ভোগের দিক থেকে টেনে আন্‌বার নিমিত্ত সাধকেরই প্রয়োজন হ'য়ে থাকে।

কেশব।—এ কথাগুলো বেশ বুঝ্‌লাম। আচ্ছা, সাধনা ক'র্‌তে মূর্ত্তির দরকার হয় কি না, মূর্ত্তি-পূজা পাপ কি না, সেইটা শুন্‌তে বাসনা।

পাগল।—নিজের স্বরূপ বোধ যত দিন না হয়, নিজকে এই দেহ ব'লে যত দিন বোধ হয়, তত দিন মূর্ত্তির সাহায্য না নিয়ে সাধনা করা যায় না। তবে ঐ ভাবে সাধনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে, স্তব স্তুতি পাঠ ক'র্‌তে ক'র্‌তে, দেহ-তত্ত্ব ও আত্ম-তত্ত্বের আলোচনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে, যখন এ ধারণা বেশ বদ্ধমূল হ'য়ে যায় যে, আমি দেহ নই, আমি আত্মা; তখন স্বভাবতঃই মন স্থির হ'য়ে আসে। তখন রূপের দিকে আর ঝোঁক থাকে না, তখন বিশ্বময় ভগবানের শক্তির খেলার দিকেই চোখ পড়ে; তাঁর গুণের জ্ঞানের ও দয়ার মহিমা দেখে মানুষ মোহিত হ'য়ে যায়। ক্রমে এমন অবস্থাও আসে যে, তাঁর মহিমার কথা মনে হ'তেই মানুষ অন্তর্মুখীন হ'য়ে পড়ে, সমাধিস্থ হ'য়ে যায়, সকল উপাধির পারে চ'লে যায়! সে এমন এক আনন্দ-সাগরে ডুবে যায়, যার কথা কোন দিন কেউ ভাষায় প্রকাশ ক'র্‌তে পারে নাই। এখানে রূপের কোন কথা নাই। এ বড় শক্ত কথা। এ অনেক জন্মের সাধনায় হয়। এ অবস্থায় সাধক জেগে থাক্‌লেও যা কিছু দেখে সব ভগবান্ ব'লেই বোধ করে।

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে হয় ইষ্ট স্ফূর্ত্তি ॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এ কথা কি তোমার মনে পড়ে ?

কেশব।—আজ্ঞ, হাঁ। এত দিন ও কথাগুলো বুঝি নাই।

পাগল।—কিন্তু এ কথা মনে রেখো যে, বাহ্য পূজা ও বিচারাদির সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানও কিছু কিছু অভ্যাস করা দরকার। তা না ক'র্‌লে শুধু বিচারের দ্বারা 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা' এ জ্ঞান পাকা হ'তে পারে না। দেহ যে আত্মা নয়, এটা ধ্যানের দ্বারা ক্রমে অনুভবের মধ্যে আসে।

এখন কথা হ'চ্ছে, মূর্ত্তি অবলম্বন ক'রে সাধনা করা পাপ কি না। এটা পাপ হ'তে পারে না। মূর্ত্তির পূজা সাধক করে না, সে ত তুমি জানই। তবে মনটাকে এক যায়গায় গোছাবার জন্য, নিজের প্রাণে খুব ভাল লাগে এমনি একটা দেব-মূর্ত্তি বা দেবী-মূর্ত্তি সে সামনে রাখে বা তার ধ্যান করে, সে ত সেই ভগবান্‌কে লক্ষ্য ক'রেই করে। এতে তার মন ভগবানের দিকে ক্রমেই বেশী ছুট্‌তে থাকে ; তাঁর কথা কইতে, তাঁর তত্ত্ব শুন্‌তে তার খুব ভাল লাগে, আর কিছু ভাল লাগে না। তাই সে ক্রমেই ভগবানের কাছে এগুতে থাকে। এতে পাপের কি আছে ? আর শাস্ত্রে লিখিত এই মূর্ত্তিগুলোও এমন ভাবের যে, এর ভিতরের খবর নিতে পার্‌লে দেখা যায়, এগুলো ভগবানের নানাবিধ শক্তি ক্রিয়া গুণ ও দয়ার কথাই মনে উদয় ক'রে দেয়।* এগুলো গাঁজায় দম দিয়ে কল্পনা করা হয় নাই। তবে যে লোকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধন-বলে প্রথম থেকেই সূক্ষ্ম তত্ত্বের স্ফূরণ হ'তে থাকে, তার বিশেষ কোন মূর্ত্তি অবলম্বন ক'রে সাধনা করার দরকার হয় না।

---

*লেখকের 'চন্দ্রজ্ঞান বা সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য' নামক গ্রন্থে, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে।

তুমি জিজ্ঞাসা কর নাই ব'লে একটা কথা বলা হয় নাই। কথাটা বড়ই দরকারী ব'লে তোমাকে জানাই, বাবা। জীব-সেবার কথাটা বোধ হয় তোমার মনে উঠে নাই। ভগবান্ যখন সকলের মধ্যেই আত্মা-রূপে আছেন, তখন মানুষ পশু পাখী ইত্যাদির সেবাও ভগবানেরই সেবা জানিও। বিশেষতঃ, এদের মধ্যে যার খাদ্যাদির অভাব হ'য়েছে, যে ব্যক্তি ব্যাধি-যন্ত্রণায় ভুগ্‌ছে অথচ দেখ্‌বার কেউ নাই, যার থাক্‌বার কোন যায়গা নাই, এইরূপ নানা দুঃখে যারা ভুগ্‌ছে সেই সব লোকের দুঃখ দূর করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা ভগবানের অতি প্রিয় কার্য্য জান্‌বে। জীবগণের প্রতি হিংসা বা ঘৃণা না করা এবং তা'দিগকে ভাল-বাসা ভক্তির একটা প্রধান অঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে, উনত্রিশ অধ্যায়ে, যেখানে ভক্তি-যোগের কথা বিস্তারিত বলা আছে, সেখানে এ কথা স্পষ্টই বলা হ'য়েছে। সেখানে এ কথাও আছে, জীবের হৃদয়ে ভগবান্ আছেন; যে ব্যক্তি জীবকে ঘৃণা করে ও কষ্ট দেয় সে ভগবান্‌কেই কষ্ট দেয়; কাজেই সে ব্যক্তি প্রতিমায় যদি ভগবানের পূজা করে, তবে সেটা ভস্মে ঘৃত আহুতি দেওয়ার মত বৃথা হবে। ঐ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদটা মনোযোগ দিয়ে পড়িও।

কেশব।—বাবা, এ সব বিষয়ে আমারও মনে যা যা সন্দেহ ছিল, তা চিরকালের মত ঘুচে গেল। আমি ভুলে গেলেও আপনি দয়া ক'রে জীব-সেবার মহিমা শুনালেন। বাবা, কি দিয়ে যে আপনার চরণ-যুগল পূজা ক'র্‌ব তা আর ভেবে পাই না।

ভাবে বিভোর হ'য়ে কেশব গুরুর চরণ দুখানি নিজের বুকের ভিতর জড়িয়ে ধ'র্‌ল। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা ক'রে পাগল ব'ল্‌ল, "এরে! রাত্রি বেশী নেই, আমি চ'ল্‌লাম।" এই ব'লে কেশবের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে, পাগল আস্তে আস্তে পা দুখানি টেনে নিল এবং তাড়াতাড়ি বাহির হ'য়ে কোন্ দিকে চ'লে গেল, আর দেখা গেল না।

তৃতীয় রাত্রি।

অধিকারের কথা।

—ঃ)*(ঃ—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।৯।৩২।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "আমাকে বিশেষরূপে আশ্রয় করিলে, স্ত্রীলোক বৈশ্য শূদ্র, এমন কি যাহারা অতি হীন কুলে জন্মিয়াছে তাহারাও নিশ্চয়ই পরম গতি পায়।"

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনেতে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যো ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় স্বায় চারণায়" যজুর্ব্বেদ। ২৬ অধ্যায়। ২ মন্ত্র।

যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায় দ্বিতীয় মন্ত্রে দেখা যায়, পরমেশ্বর বলিতেছেন, "আমি যে প্রকার সকল মনুষ্যের কল্যাণকর অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে সুখকর চারি বেদের পবিত্র বাণী দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ করিতেছি, সেইরূপ হে মনুষ্যগণ, তোমরাও মনুষ্যমাত্রকেই এই বেদরূপ বাণীর উপদেশ করিবে। এই কল্যাণীয় উপদেশ তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্য্য (অর্থাৎ বৈশ্য), শূদ্র, ভৃত্য এবং অরণ অর্থাৎ অতি শূদ্র বা অস্পৃশ্য প্রভৃতিকে প্রদান করিবে।

মানুষের মনের আঁধার যতই ঘুচ্‌তে থাকে ততই তার প্রাণে একটা

বল বাড়্তে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দও দেখা দেয়। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবেই লোকে, নানা কুসংস্কারের দাস হ'য়ে, দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। কেশবের মনটা ভাল, স্বভাবও পবিত্র, কাজেই তার শান্তি আস্বারই কথা, তবে যাতে ঠিক্ ঠিক্ শান্তি আসে সেই জ্ঞানেরই কিছু অভাব ছিল। তার ধর্ম্ম ভাবের দরুণই, ভগবানের দয়ায়, একজন ভাল সাধুর উপদেশ পাবার সুযোগ সে পেয়েছে। তাই, দিনের দিন ধর্ম্মের ও আচারের রহস্য যতই জান্তে পার্ছে ততই তার আনন্দ বেড়ে যাচ্ছে।

ভাদ্র মাস। অমাবস্যা তিথি। রাত্রি চার ছয় দণ্ড হ'য়েছে। বেশ বৃষ্টি প'ড়্ছে। কেশব নিয়ম মত সন্ধ্যা বন্দনা ক'রে, ভজন-সুখে মাতোয়ারা হ'য়ে ব'সে আছে, আর গুরুদেবের অপার দয়ার কথা মনে হওয়ায় তার দুই চোখে জলধারা বইছে। এমনি সময় পাগল এসে হাজির। বৃষ্টির জলে সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছে। পরণের ময়লা ও ছোট কাপড়খানা হ'তে জল প'ড়্ছে। কেশব গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে, একখানা শুক্‌ন ন্যাক্‌ড়া এনে তাঁর গা মুছে দিতে চাইতেই পাগল হাতের ইসারা ক'রে নিষেধ ক'র্‌ল। কেশব পাগলকে ভিজা কাপড় ছেড়ে শুক্‌ন কাপড় পরার জন্য যোড়হাত ক'রে অনেক ব'ল্‌ল। পাগল সে কথায় কাণ না দিয়ে ব'ল্‌ল 'যা, দেখ্ ঘরে কি আছে। কিছু খেতে দে। কলার পাতা থাকে ত তাতে ক'রেই দে।' কেশব তাড়াতাড়ি খই মুড়ি গুড় কলা শশা এই সব এনে দিল। পাগল নিজের খুসি মত কিছু খেয়ে এসে ব'স্‌ল। কেশব অতি ভক্তির সহিত গুরুদেবের প্রসাদ গ্রহণ ক'রেই তাঁর কাছে এসে ব'স্‌ল।

পাগল।—কেমন লাগ্ছে রে?

কেশব।—আজ্ঞে, বাবা, বড়ই আনন্দ পাচ্ছি।

পাগল।—আর কি কিছু তোর জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার আছে?

কেশব।—এই কত দিনের মধ্যে আবার নানা কথা যুটে

গিয়েছে। আপনার কাছে এ পর্য্যন্ত যে সব সিদ্ধান্ত শিখেছি, সেগুলো শুনে বহু লোকেই খুব কাজের কথা ও খাঁটি কথা ব'লে মেনে নিচ্ছে। তবে কতকগুলো গোঁড়া লোক আছে তারাই ঝগড়া ক'র্‌তে আসে। কিন্তু আপনার কি কৃপা, সে সব ঝগড়ায় আর আমার জবাব দিবার দরকার হয় না। যারা আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে, তাদেরই কেউ কেউ নানা যুক্তি ও শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে ওদেরে হটিয়ে দেয়। এখন যে কয়টা নূতন কথা যুটে গিয়েছে, তাই আপনাকে বলি।

পাগল।- কি? বল্ না।

কেশব।—স্ত্রী-শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজায় ও ভোগ দেওয়ায় অধিকার নাই, প্রণব উচ্চারণে অধিকার নাই, কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে। ভগবান্ কি তা হ'লে ইচ্ছা করেন না যে, স্ত্রী-শূদ্রেরা প্রাণ ভ'রে বা ইচ্ছামত তাঁর ভজন করে?

পাগল।—কেন্ রে বেটা, তোর এ ধারণা হ'ল কোথা থেকে যে, ভগবান্ কাউকে খাতির করেন আর কাউকে ঘৃণা করেন?

কেশব।—ভগবান্ এমন অবিচার করেন এ কথা আমি মনে করি না, তবে দুনিয়ায় যে এই রকমই দেখি।

পাগল।—আসল কথা বেশ ক'রে মন দিয়ে শোন. তা হ'লেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে। অধিকার কার কাছে আর কার নাই? যে যা নিজ অধীনে আন্‌তে পারে, নিজের ব্যবহারের মধ্যে আন্‌তে পারে, তাতেই তার অধিকার আছে ব'ল্‌তে হবে। তুমি মুখে স্বীকার কর আর নাই কর, সে ত তার ব্যবহার ক'র্‌বেই, কেন না সেটা তার নিজের হাতের মধ্যে। যে তা ক'র্‌তে পারে নাই, সে মুখে হাজার ব'লুক না কেন 'আমার এতে অধিকার আছে' কিন্তু সে তার ব্যবহার ক'র্‌তে পার্‌বে না, আর ব্যবহার করার ভান ক'র্‌লেও সেটা কেবল ছেলে খেলাই হবে।

প্রথম ধর বেদের কথা। বেদ অর্থ জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, তাই প্রকৃত বেদ এবং তা নিত্য। তবে লোকে সাধারণতঃ ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব নামে চারিখানি অতি প্রাচীন মহা গ্রন্থকেই বেদ বলে। এই চারিখানা মহাগ্রন্থেরও আবার দুই দুই ভাগ আছে—কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড। সংহিতা কর্ম্মকাণ্ড আর উপনিষদ্ জ্ঞানকাণ্ড। কালে কালে বেদের কর্ম্মকাণ্ড উঠে গিয়ে পুরাণের ও তন্ত্রের কর্ম্মকাণ্ড চলিত হ'য়েছে। কাজেই সংহিতার আলোচনা আজ কাল অতি কম লোকেই ক'রে থাকে। উপনিষদে নিত্য-জ্ঞানের কথা আছে এবং তার ভাষাও অনেকটা আজ-কালকার ভাষার মত। তাই সেগুলো এখনও অনেকেই চর্চ্চা করে।

বেদ-সংহিতা অতি পুরাতন জিনিস। তার ভাষা ছন্দ ব্যাকরণ অভিধান সব অতি পুরাতন কালের। সে সব তা এখন চলিত নাই। ঐ সব তা না শিখ্‌লে বেদ-সংহিতা শুধু প'ড়্‌লেও কিছু বুঝা যায় না। আগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বংশের ছেলেরা উপনয়ন হ'লে গুরুগৃহে প'ড়্‌তে যেত। সেখানে দীর্ঘ দিন গুরু-সেবা ক'র্‌ত আর ঐ সব শিখ্‌ত; সঙ্গে সঙ্গে সাধন ভজন ক'র্‌ত ব'লে ঐ সব জিনিস বুঝ্‌তে পার্‌ত। এখন সে সব প্রথা উঠে গিয়েছে। যারা মুখে বলে 'আমাদের বেদে অধিকার আছে' তাদের পৌনে ষোল আনাই বোধ হয় কোন দিন চোখেও দেখে নাই বেদ-সংহিতা কেমনধারা জিনিস, তা পড়া বা বুঝা ত অনেক দূরের কথা। ভগবান্ বেদব্যাস লোকের ঐ দশা দেখে, বেদের জিনিসগুলো সোজা ক'রে গল্পের সাহায্যে শিখাবার জন্য, আজ-কালকার ভাষায় মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত লিখেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টই আছে যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলে যারা বেদ প'ড়্‌তে ও বুঝ্‌তে পারে না তাদের এবং স্ত্রীলোক ও শূদ্রদের জন্যই তিনি ঐ দুই গ্রন্থ রচনা ক'রেছিলেন। কাজেই বুঝে দেখ, বেদ-সংহিতায় এখন অধিকার খুব কম

লোকেরই আছে, কিন্তু বেদে বা ভগবদ্ জ্ঞানে (নিত্য জ্ঞানে) সকলেরই অধিকার দিবার জন্য ঋষিরা অনেক চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন।

এখন কথা হ'চ্ছে পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক ও শূদ্রের এতে অধিকার ছিল কি না। তার উত্তর এই যে, পূর্ব্বে লোকে এখনকার মত কেবল দেশাচার বা লোকাচার মতই কাজ ক'র্‌ত না। তারা বিশেষ বিচার ক'রে কাজ ক'র্‌ত। যার মতি-গতি ভাল দেখ্‌ত, তারেই তারা তুলে নিয়ে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে মানুষ ক'রে তুল্‌ত। দাসী জাবালীর পুত্র জাবাল, গুরুকুলে বাস ক'রে শিক্ষালাভ করার ইচ্ছা হওয়ায়, গৌতম মুনির আশ্রমে যায়। মুনি তার বাপের নাম জিজ্ঞাসা করেন। জাবাল তা ব'ল্‌তে পারে না। মায়ের কাছে শুনে গিয়ে পর দিন সে মুনিকে ব'লেছিল, 'মা ব'লেছেন, অতি গরিব ব'লে যৌবনে অনেক যায়গায় তাঁকে দাসীর কাজ ক'র্‌তে হ'য়েছিল, সেই সময় আমার জন্ম হ'য়েছে, কাজেই আমার পিতা যে কে, তা তিনি ব'ল্‌তে পারেন না।' তখন মুনি ব'ল্‌লেন, 'সত্য কথা কহা ব্রাহ্মণের লক্ষণ। তুমি সত্য ব'লেছ, সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণ। আজ থেকে তোমার নাম সত্যকাম। এস, তোমাকে উপনয়ন দিয়ে আমি বেদপাঠ করাব।' কাজেও তাই হ'য়েছিল। শাস্ত্রে আরও দেখা যায় যে, নারদ ব্যাস বশিষ্ট প্রভৃতি যাঁরা আমাদের মাথার মুকুট, যাঁরা না জন্মিলে হয় ত হিন্দুর নাম জগতে শ্রদ্ধা পাবার কোনই সুযোগ পেত না, সেই সব ঋষিরা অতি হীন স্থানে জন্মেছিলেন। তাঁদের অধিকার দিতে ত কেউ কৃপণতা করে নাই। তবে যাদের কিছু শিখ্‌বার মত বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই ছিল না, তারাই শূদ্র হ'য়ে থাকৃত। তারা সুযোগ পেলেও শিখ্‌তে পার্‌ত না, কাজেই তাদের অধিকার থাকৃবে কেমন ক'রে?

তার পরে স্ত্রীলোকের কথা। স্ত্রীলোকদের মধ্যেও যারা শিখ্‌বার ইচ্ছা ও ক্ষমতা রাখ্‌ত, তাদের ত কেউ বেঁধে রাখে নাই। মৈত্রেয়ী

গার্গী বাচক্নবী সুলভা প্রভৃতি মেয়েদের নাম শুনা যায়। তাঁরা ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ ক'রেছিলেন। চণ্ডী-পাঠের প্রথমে দেবী-সূক্ত অবশ্য প'ড়্‌তে হয়। ইহা বেদেরই একটা সূক্ত বা শ্লোকমালা এবং ইহা একজন স্ত্রীলোকের রচনা। এঁর নাম ছিল বাক্ আর পিতার নাম ছিল অম্ভৃণ ঋষি। কাজেই দেখ, তাঁদের অধিকার নাই ব'লে কেউ ফেলে রাখ্‌তে পারে নাই।

সময়ে সব জিনিসেরই অবনতি এসে পড়ে। এ বিষয়েও তাই হ'য়েছে। পরবর্ত্তী কালে মানুষ যখন বেশী স্বার্থপর হ'য়ে প'ড়্‌ল, তখন যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, তারা অপর সকলকে নানা কৌশলে নীচুতে রেখে নিজেরা আধিপত্য ও সম্মানটা একচেটে ক'রে নিয়েছিল। আর যারা নীচে প'ড়ে রইল, তারা বংশানুক্রমে আপনাদিগকে হীন ভাব্‌তে ভাব্‌তে হীনই হ'য়ে গেল ; আর উঠ্‌বার চেষ্টাও ক'র্‌ল না, উঠ্‌লও না। তাই হিংসা ঘৃণা ও বিবাদ সমস্ত সমাজের মধ্যে লেগেই আছে, সকলকে দুর্ব্বল ক'রে ফেল্‌ছে, সুখ শান্তি মোটেই নাই।

এখন শোন প্রণবের কথা। বেদের সার ব্রহ্ম-গায়ত্রী, আর ব্রহ্ম গায়ত্রীর সার প্রণব। প্রণব হ'চ্ছে বীজ, তার অর্থ পাবে ব্রহ্ম-গায়ত্রীতে আর বিস্তারিত অর্থ পাবে বেদসকলে। অর্থ বুঝে প্রণবের সাধনা ক'র্‌তে হয়, তবে প্রণবে অধিকার জন্মে। প্রণবই হ'চ্ছে ভগবানের স্বাভাবিক নাম এবং তাঁর সকল নামের শ্রেষ্ঠ নাম। তার সাধনা না ক'র্‌তে পারাই দুর্ভাগ্য, কিন্তু তার সাধনা ক'র্‌বার মত ক্ষমতা যদি কারো থাকে, তবে সে তা ক'র্‌লে তার পাপ হবে, এটা নিতান্তই গায়ের জোরের কথা। প্রণব বা ওঙ্কারের অর্থ অতি গভীর। সে কথা ভাল ক'রে বুঝ্‌বার শক্তি এখন তোমার হয় নাই। কাজেই এখন তা থাক্।

তোমাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ব বেদ জগতে উৎপত্তি॥

কেশব।—আজ্ঞে, হাঁ। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে এ কথা ব'লেছিলেন।

পাগল।—এখন প্রণব বা ওঙ্কার-রূপী ঈশ্বর সকলের মধ্যেই প্রাণ-সূত্র-আকারে আছেন। সেই সূত্রে (ভগবানে) যাতে সর্ব্বদা মন থাকে, তারই জন্য বাহিরে পৈতা ধারণ করা হয়। এই হ'চ্ছে উপনয়নের সাধনা-গত প্রকৃত ভাব। এই ভাব নিয়ে যারা না চলে তাদের কিছু সূতা ধারণ করাই সার হয়। আর সেই প্রাণ-সূত্রকে ধ'রে যারা কাজ ক'র্‌তে পারে, ওটীকে যারা ধ'রে থাকে, তাদের বাহিরে পৈতা ধারণ করা বা না করায় কিছু আসে যায় না। সদ্‌গুরু লাভ ক'রে যারা এই প্রণবের সাধনা করে, তারাই এর উচ্চারণে প্রকৃত অধিকারী। নচেৎ ও শব্দটা সাধারণতঃ যে ভাবে উচ্চারণ করা হয়, অতি হীন শূদ্র যাকে বলা হয়, তার পক্ষে সে ভাবে উচ্চারণ করা কি অসাধ্য ব'লে মনে কর?

কেশব।—আজ্ঞে, না। সে এত কথা ব'ল্‌তে পারে, আর ও কথাটা ব'ল্‌তেই পারে না, এ কেমন ক'রে হয়?

পাগল।—তা হ'লে ওটা শুধু মুখে ব'ল্‌লেই হ'য়ে গেল না। উহার সাধনা যারা ক'রেছে তারাই ওর মর্ম্ম জান্‌তে পারে, তাদের উচ্চারণই সার্থক অর্থাৎ ফল দেয়। তাদেরই প্রকৃত পক্ষে অধিকার আছে ব'ল্‌তে হবে। এখন বুঝ্‌লে?

কেশব।—আজ্ঞে, হাঁ। আমাদের পক্ষে কি?

পাগল।—এতদিনে বুঝি এই বিদ্যা হ'ল, রে বেটা গাধা? সাধনা দিবার সময় তোর ক্রিয়ার সঙ্গে এটা মিলিয়ে দেই নাই?

কেশব।—আজ্ঞে, হাঁ। বুঝ্‌লাম এই সাধনাই প্রণবের সাধনা, আর এই সাধনা হ'তেই ও বিষয়ে অধিকার জন্মে। শুধু কোন জাতি বিশেষে জন্মিলেই অধিকার থাকে বা থাকে না, এ কথা ঠিক নহে।

বাবা, এখন ঐ বিষয়টা শুন্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে অর্থাৎ স্ত্রীলোকও

শূদ্রের পক্ষে দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা ও ভোগ দেওয়ার অধিকার আছে কি না।

পাগল—স্ত্রীলোক এবং শূদ্রদিগকে দেব-দেবীর আরাধনার জন্য গুরু মন্ত্র দিয়ে থাকেন, সেই মন্ত্র জপ ক'র্‌তে বলেন, সেই দেব বা দেবীর রূপ ধ্যান কর্‌'তে ব'লে থাকেন এবং দর্শন লাভ ক'র্‌তে ব'লে থাকেন। এ জান ত?

কেশব—আজ্ঞে, হাঁ। এমন কি অনেক স্থানে, বাহিরে কোন মূর্ত্তি সাম্‌নে না রেখে, ফুল তুলসী বা ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজাও শিখান হয় দেখি। সেখানে ত দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে, তারই পূজা ক'র্‌তে হয়। এই যে ষষ্ঠী সুবচনী লক্ষ্মী সরস্বতী মনসা প্রভৃতির পূজা, বার মাস যা পুরোহিত ঠাকুররা যজমানের বাড়ী ক'রে থাকেন, তার অনেক স্থলেই মূর্ত্তির কোন ব্যবহার নাই। সেগুলো এই রকমেরই পূজা।

পাগল—তা হ'লে এই কথাই প্রমাণ হ'চ্ছে যে, কোন দেবতার পূজা, তৈয়ারি মূর্ত্তি সাম্‌নে রেখেও করা হয়, না রেখেও করা হয়। এখন, যে সব স্ত্রীলোক বা শূদ্রকে গুরু-ঠাকুররা পূজা শিখান, তারা যদি ইষ্ট মূর্ত্তি সাম্‌নে রেখে পূজা করে, তাতে কি দোষ হ'তে পারে? তবে ঐ মূর্ত্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদি যে সকল ব্যাপার আছে, সেইগুলো তাদের জানা দরকার। তা যদি তারা শিখে নেয়, তবে আর তাদের মূর্ত্তিপূজায় কোনই বাধা দেখা যাচ্ছে না। দেবতা ত আর ঐ স্থূল মূর্ত্তি নয়। বিনা মূর্ত্তিতে যাঁর পূজা হয়, মূর্ত্তির ভিতরে তাঁকেই স্থাপন ক'রে পূজা করা হয়। এ অবস্থায়, মূর্ত্তি অবলম্বন ক'রে পূজা করায় ও ভোগ রাগ দেওয়ায় শূদ্রের বা স্ত্রীলোকের কোন দোষ হ'তে পারে না।

মোটের উপর, সব ব্যাপার জানা চাই, শেখা চাই, প্রাণের গাঢ় ভক্তি ঢেলে দিয়ে পূজা করা ও ভোগ রাগ দেওয়া চাই। তা হ'লে দেবতা সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন না। আর যদি ভক্তি শ্রদ্ধা না

থাকে, পূজাদির ক্রম ও মর্ম্ম জানা না থাকে, পবিত্র ভাবে যদি করা না হয়, তবে জাতিতে ব্রাহ্মণ হ'লেও এবং পুরুষ লোক হ'লেও তার পূজা সিদ্ধ হয় না, দেবতা তুষ্ট হন না।

এ কিছু জেদাজেদির কথা নয়, জোর বলের কথাও নয়। নিয়ম মত এবং ভালবাসার সঙ্গে কাজ না ক'র্‌লে মানুষই সন্তুষ্ট হয় না, তখন দেবতার কোন্ কথা? কাজেই যার এ সব আছে তারই অধিকার আছে—স্ত্রীলোক বা পুরুষ, জন্মগত জাতিতে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র ব'লে কোন কথা হ'তে পারে না। তবে সাধারণতঃ স্ত্রীলোক ও শূদ্রের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা তেমন না থাকায়, ঐ সব গুণ তাদের লাভ করা ঘটে না ব'লেই অধিকার নাই, এ কথা বলা হয়।

তোমাদের হরি-ভক্তি-বিলাসের টীকায় ও ভক্তমাল গ্রন্থে ভক্তিমান্ শূদ্রদিগকে শালগ্রাম অর্থাৎ নারায়ণ-শিলার পূজায়ও অধিকার দেওয়া হ'য়েছে।

কেশব—আজ্ঞে হাঁ, এ কথা শুনেছি। তবে ওগুলো দেখা বা পড়া আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

বাবা, আর একটা কথা মনে উঠ্‌ল। জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সাহস হ'চ্ছে না। আপনি অনেকক্ষণ ধ'রে কথা ব'ল্‌ছেন, নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট হ'চ্ছে। আজ আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব না, অন্য দিন শুন্‌ব।

পাগল—বল্ না, বেটা, কি ব'ল্‌বি। আমার কোন কষ্ট নাই।

কেশব—আচ্ছা, লোকে বলে, ব্রাহ্মণের কাছে ভিন্ন অন্য কারো কাছে ধর্ম্ম উপদেশ শুন্‌তে নাই। বিশেষতঃ জাতিতে ব্রাহ্মণ হ'য়ে অব্রাহ্মণের কাছে ধর্ম্ম-উপদেশ নিলে, সেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-তেজ নষ্ট হয়। এ কথাটা আমি ভাল বুঝ্‌তে পারি না। আমার ত মনে হয়, যে ব্যক্তি প্রকৃত ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম-তত্ত্ব যে জানে তার কাছেই ধর্ম্ম-উপদেশ নিতে হয়। তাতে কারো হানি হয় না বরং উপকারই হয়। এতে জাতি-ভেদ দেখ্‌বার

দরকার নাই। আমার এ ধারণাটা ঠিক কি না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

পাগল।—দেখ্, এই সামাজিক জাতি যা এখন চ'ল্‌ছে, তার সঙ্গে ধর্ম্ম-জগতের জাতি বা প্রকৃত জাতির রাত্রি দিন তফাৎ। ভগবান্ জাতি ভাগ ক'রেছিলেন গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে, আর এখন যে সামাজিক জাতি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ তার সঙ্গে গুণ-কর্ম্মের সম্পর্ক খুবই কম আছে। এখন সমাজে হ'য়েছে জন্মগত জাতি, গুণ-কর্ম্ম থাক্ আর না থাক্। এ জাতি-বিভাগ নিয়ে ধর্ম্মে অধিকার বা অনধিকারের কোন কথাই হ'তে পারে না। গুণ-কর্ম্ম অনুসারে যে জাতি, তাই নিয়ে ধর্ম্ম-বিষয়ে অধিকার বা অনধিকারের কথা বলা হ'য়েছে।

একটা মোটা কথা শোন্। যে ডাক্তারি বা কবিরাজি বিদ্যা ভাল জানে, চিকিৎসা ভাল জানে, সে-ই রোগ চিন্‌তে পারে, তার দ্বারা চিকিৎসা করা'লে ব্যারাম ভাল হ'তে পারে। সে যদি সমাজের অতি হীন কুলেও জন্মে থাকে, তবু সে ব্যারাম সারাতে পার্‌বে। আর যদি কেউ সমাজের খুব উঁচু কুলেও জন্মে থাকে, অথচ ঐ বিদ্যা যদি তার না থাকে অথবা সে বিষয়ে অতি সামান্য জ্ঞান থাকে, তবে তার দ্বারা কি উৎকট ব্যাধির চিকিৎসা হ'তে পারে, না ব্যারাম সারান যেতে পারে?

ভগবানের ভজন দ্বারা মনের ব্যারাম দূর ক'রে শান্তি লাভ ক'র্‌তে হয়, তার পরে না সেই পরম আনন্দ। সুতরাং ভগবান্‌কে যে জানে, তাঁর ভজন যে ক'রেছে, তাঁকে যে পেয়েছে, সে-ই ত তাঁর ভজন শিখাতে পারে, তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে সামাজিক জাতি-কুলের প্রশ্ন কি আছে? শ্রীচৈতন্য দেব ব'লেছেন—

কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র সন্ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥

শ্রীচৈতন্য দেব নিজে রায় রামানন্দের কাছে উপদেশ শুনেছিলেন

এবং প্রত্যুম্ন মিশ্রকে উপদেশ শুনবার নিমিত্ত তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। (রায় রামানন্দ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না।) ভগবানের জাতি কুল কিছু নাই, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন। তাঁকে পেতে হ'লে তাঁরই মত হ'তে হবে, জাতি কুল বিদ্যা ধন প্রভৃতির অভিমান ছাড়তে হবে। ধর্ম্ম-জগতের যত বড় লোক সবারই এই দশা।

ধর্ম্ম-জগতে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ—যে ব্রহ্মকে জেনেছে, যে ব্রহ্মকে পেয়েছে ; কাজেই যার ভেদ-জ্ঞান ও সঙ্কীর্ণতা দূর হ'য়েছে, সেই ভগবানের খবর জানে ও দিতে পারে। এই জন্যই বলা হয় 'ব্রাহ্মণের কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা ক'রতে হয়, অন্যের কাছে নয়' অব্রাহ্মণ অর্থাৎ যার তত্ত্ব-জ্ঞান নাই, তার কাছে শিখলে, ভুল পথে চ'লে আরো অধঃ-পতন হয়। এটা সামাজিক জাতি ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয় নাই। এ সম্বন্ধে তোর যে ধারণা আছে সেটা ভুল নয়। যারা জাতি কুল বিদ্যা ধন ইত্যাদির অভিমানে বদ্ধ, তারা ভগবান্‌কে কখনও জানতে পারে না। তবে কথা হ'চ্ছে কি জানিস্, যে যেমন লোক সে তেমনি লোককেই ভালবাসে আর তার সঙ্গেই উঠা বসা করে। সুতরাং সামাজিক জাতির অভিমানে একান্ত বদ্ধ এক ব্যক্তি সামাজিক জাতির অভিমানে একান্ত বদ্ধ আর এক ব্যক্তিকে যে বরণ ক'রবে, তা ত স্বাভাবিক। কারণ মুক্ত ব্যক্তির নিকট যেতে তার প্রবৃত্তিও আসে না এবং তার সামর্থ্যও নাই।

কথা শেষ ক'রে পাগল ব'লল, "এখন যাই"। কেশবের প্রাণে একটা আঘাত লাগল—সুখের স্বপন ভেঙ্গে গেল। কেশব কাতর-প্রাণে গুরুদেবের চরণে প্রণাম ক'রে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। পাগল, আশীর্ব্বাদ ক'রে, আপন মনে চ'লে গেল যেন তার প্রাণে কিছুই স্পর্শ করে নাই।

চতুর্থ রাত্রি।

অশৌচের কথা।

—ঃ*ঃ—

"এবং গুণবিশেষেণ সূতকং সমুদাহৃতম্।" দক্ষসংহিতা। ষষ্ঠ অধ্যায়।

(দক্ষ সংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে, কি কি অবস্থায় কত দিন অশৌচ হয়, তাহা বিস্তারিত বলার পর উপসংহারে বলা হইয়াছে) এইরূপে গুণের ন্যূনাধিক্য অনুসারে অশৌচের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইল।

কয়েক মাস যায়, পাগলের সঙ্গে আর কেশবের দেখা হয় না। কেশব বাবাজি গুরুদেবের উপদেশ মত সাধন ভজন করে; ভগবানের সেবা, লোক-সেবা এবং জীব-সেবা নিয়ে আছে। পরম আনন্দে দিন কেটে যাচ্ছে। কিন্তু গুরুদেবকে দেখ্‌বার জন্য তার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল। যাঁর কৃপায় সে আজ অমৃত পান ক'র্‌ছে, তাঁকে না দেখ্‌তে পেয়ে তার হৃদয় সময় সময় বড়ই অস্থির হ'য়ে ওঠে।

অগ্রহায়ণ মাস। অল্প অল্প শীত প'ড়েছে। এক অন্ধকার রাত্রিতে কেশব, ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, বারান্দায় শু'য়ে শু'য়ে কেবল গুরুদেবের কথাই ভাব্‌ছে, চোখে ঘুম নাই। হঠাৎ আঙ্গিনায় কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কেশব উঠে ব'স্‌ল। পাগল সাম্‌নে এসেই সঙ্গে যাবার জন্য তাকে ইসারা ক'র্‌ল। সেও ছায়ার ন্যায় তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের পেছনে পেছনে চ'ল্‌ল। কারো মুখে কথা নাই। কতক্ষণ পরে দুজনেই গ্রামের দূর প্রান্তে নদীর ধারে শ্মশানে এসে উপস্থিত। ভয়ানক স্থান। কেশবের শরীরটা একবার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সে তখনি মনকে একটা ধমক দিল, "হতভাগা! যাঁর জন্য আমার প্রাণ অস্থির, সেই প্রাণের

দেবতা আজ আমার সাম্‌নে, আর শ্মশান ব'লে ভয়! তাঁর চরণ দেখ্‌তে পেলে আমি মরণকেও ডরাই না, সে মরণ আমার বড় আরামের, বড় আনন্দের, বড় সাধের। থাম্‌, তোর কোন কথা আমি এখন শুনতে রাজি নই।"

নীরবে পাগল ব'স্‌ল, নীরবে কেশবও ব'স্‌ল। কতক্ষণ পরে পাগল জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল, "কেমন চ'ল্‌ছে রে?"

কেশব।—বাবা, বড় আনন্দে আছি। আপনার অসীম দয়ার কথা যখনি আমার মনে হয়, তখনি আমার দুই চোখ জলে ভ'রে আসে। বাবা, আপনি যে এক এক বার দেখা দিয়ে কোথায় চ'লে যান, আর আপনাকে পাই না। হয় ত একদিন শুন্‌লাম আপনি অমুক যায়গায় আছেন, তখনি ছুটে সেখানে যাই। কিন্তু আমার কি পোড়া কপাল, আপনার চরণ-দর্শন সেখানে পাই না, আর খুঁজেও কোন সন্ধান পাই না। অভাগা ছেলের কথা আপনি একেবারে ভুলে যান, এইটীই আমার দুঃখ।

পাগল।—(একটু ক্রোধ দেখিয়ে) হাঁ, এই বুঝি তোর এত দিনে জ্ঞান হ'য়েছে? আমি কি তোকে ছাড়া? তোর মধ্যে আমি নাই? এই দেহটাকে বুঝি আমি ব'লে ঠাউরে ব'সে আছিস্‌?

কেশব।—না বাবা। আপনি আমার ভিতরে আছেন, তা জানি, তথাপি ঐ দেহ নিয়ে আপনি যখন আসেন তখন প্রাণটা বড়ই আশ্বস্ত হয়। ঐটার সঙ্গে আপনাকে দেখ্‌তে বড় সাধ হয়।

পাগল।—আচ্ছা, আচ্ছা. এখন রেখে দে ওসব কথা। কি জান্‌তে চা'স তাই এখন বল্‌।

কেশব।—কিছু জান্‌তে ত আর প্রাণ চায় না, যা দিয়েছেন তাই নিয়েই থাক্‌তে ইচ্ছা হয়। লোক-সেবা এবং জীব-সেবাই ভগবানের সেবা এবং আপনারও সেবা—আপনি এই যা শিখিয়েছেন, আমিও তাই

মনে করি। সেই সেবা-ধর্ম্ম নিয়ে আছি ব'লে, লোকের সন্দেহ দূর করার জন্য অনেক কথা আপনার কাছে আমার শোনার দরকার হয়, নচেৎ ও সবে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

পাগল।—ভাল, কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌বি, তাই কর্।

কেশব।—অশৌচ হ'লে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু ক'র্‌তে নাই, এ কথার তাৎপর্য্য কি? অশৌচ অবস্থায় বা অপবিত্র স্থানে ভগবানের নাম করা, কি তাঁকে স্মরণ করায় পাপ হয় কি? অনেকে বলে যে, ওরূপ ক'র্‌লে পাপ হয়, ও ক'র্‌তে নাই। আচ্ছা তা হ'লে, যদি কেহ অশৌচের মধ্যে মারা যায়, আর অশৌচ ব'লে মরণের আগে ভগবানের নাম ক'র্‌বার শক্তি থাক্‌তেও যদি না করে, তবে তার সদ্‌গতি হ'ল না ত।

পাগল।—অশৌচ কি, ভগবানের নাম করা বা ভগবান্‌কে স্মরণ করা, কোন দেব-দেবীর ভজনাই বা কেমন ক'রে ক'র্‌তে হয়, কোন্ উদ্দেশ্য নিয়েই বা তা করা হয়—এই সব যদি একটু তলিয়ে দেখ, তা হ'লে ওরকম সন্দেহ আস্‌বার কোন কারণই থাকে না।

কেশব।—আমি ত ও সন্দেহ থাক্‌লেও তার কোন ধার ধারি না। আপনার আদেশ, আপনার দেওয়া সাধনা, তাই আমার যথা-সর্ব্বস্ব; কাল-অকাল সুস্থান-কুস্থান শৌচ-অশৌচ আমার মনেই আসে না। তবে যাতে সকলকে ঐ ব্যাপারগুলো ভাল ক'রে বুঝাতে পারি, তেমনি ক'রে এ অধমকে দয়া ক'রে বলুন।

পাগল।—অশৌচ মানে অশুচির ভাব, অপবিত্রতা। অশৌচ আবার দুই রকমের, বাহ্য এবং আন্তর অর্থাৎ বাহিরের আর ভিতরের। মল-মূত্রাদি শরীরে লাগ্‌লে অথবা মল-মূত্রাদি অপবিত্র জিনিসে পূর্ণ স্থানের ভিতর দিয়া গেলে বাহিরের অশৌচ হয়। ইহা জলে স্নান প্রভৃতির দ্বারা দূর ক'র্‌তে হয়। কুবৃত্তি কুচিন্তা, ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের লালসা, শোক, দুঃখ ইত্যাদি, যা মনকে অস্থির করে, সেইগুলো যখন

মনের মধ্যে খেলা ক'র্‌তে থাকে, তখনই ভিতরে অশৌচ হ'য়েছে জান্‌বে। সত্য পথে চলা, ইন্দ্রিয় দমন করা, জগতের অনিত্যতা চিন্তা করা, আত্মার স্বরূপ আলোচনা করা ইত্যাদি দ্বারা সেই অশৌচ দূর হয়। ভিতরে যতক্ষণ বিশুদ্ধ ভাব না আসে, শান্তি না আসে, ততক্ষণ ভিতরের অশৌচ যায় না।

তুমি যে অশৌচের কথা ব'লেছ, সেটা মৃতাশৌচ আর সন্তান হ'লে যে অশৌচ হয়, তার উপর লক্ষ্য ক'রেই ব'লেছ। এ দুটাই ভিতরের অশৌচ। এই দুই অবস্থায় লোকে সব জাতীয় দেব-কার্য্য, অনেকে এমন কি নিজের নিত্য-কৃত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি পর্য্যন্ত, বাদ দিয়ে থাকে। ভিতরের অশৌচ অবস্থা কি, তা তোমাকে একটু আগেই ব'লেছি।

ভগবানের নাম ক'র্‌তে হ'লে, ভগবান্‌কে স্মরণ ক'র্‌তে হ'লে, মন প্রাণ এক ক'রে ক'র্‌তে হয়। মন আর সব কথা অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় ভোগ-বিলাস বা সুখ-দুঃখের কথা ভুলে কেবল ভগবান্‌কেই ভাব্‌বে, তাঁরই নাম উচ্চারণ ক'র্‌বে। এখন, মন যদি শোকে একবারে-গ'লে যায়, মৃত ব্যক্তির ভালবাসার কথা জেগে উঠায় মন যদি কেবল কেঁপে কেঁপে ওঠে, তা হ'লে ভগবানের চিন্তা যে আসেই না, যদিও বা জোর ক'রে কখন একটু আধটু আনা যায় তা উপর উপরে কেবল। এই জন্যই কোন জ্ঞাতি অর্থাৎ নিকট আত্মীয় মারা গেলে যে অশৌচ হয়, সেই সময়ে কোন দেব-কার্য্যাদি করা হয় না। এই না করার যে ব্যবস্থা সেটা করা হ'য়েছে শুধু অজ্ঞানী সাধারণ লোকের জন্য, তত্ত্বজ্ঞানী বা প্রেমিক সাধকের জন্য এ বিধি নয়। ওরূপ ব্যক্তির মন সর্ব্বদাই অতি পবিত্র, বিশেষতঃ পিতা পুত্র স্ত্রী আত্মীয় প্রভৃতির মৃত্যুতে তাঁর মনে কোন দুঃখ বা দুর্ব্বলতা আসে না। গৃহস্থ হ'লে তিনি তাঁর সামাজিক নিয়ম অনুসারে অশৌচ পালন করেন বটে, কিন্তু ঐ অশৌচ তাঁর সাধনা

বন্ধ ক'র্‌তে পারে না এবং তিনি তা বন্ধও করেন না।

এ বিষয়ে কেউ কেউ বলেন, নিত্য সাধনা যে সন্ধ্যা-বন্দনা, তা বাদ দিতে নাই। সে কথাটা ঠিক। নিত্য-কর্ম্ম চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্তই ক'র্‌তে হয়, ওর মধ্যে অন্য কোন কামনা নাই। কাজেই শোকের দরুণ যদি ঠিক ঠিক নাও হয়, তাতে তেমন দোষ নাই, যেটুকু হয় সেইটুকুই লাভ। তবে যে শোকে একবারে গ'লে গিয়েছে, সে ত ক'র্‌তেই পারে না, তার আর কি করা যায়? সকাম উপাসনা অর্থাৎ এ জগতে বা পর-লোকে কোন সুখ-ভোগ পাবার লালসায় যে পূজা প্রভৃতি, সেটা ও সময় ক'র্‌তেই নাই। কারণ একে ত ও জিনিসটাই ভাল নয়, তারপর আবার উহা ক'র্‌তে গিয়ে মনের গোলে নানা ক্রটী ক'রে ফেল্‌লে আশা পূর্ণ ত হয়ই না, আরও নানা বিপদ ঘ'ট্‌বার সম্ভাবনা।

এখন কথা হ'চ্ছে এই যে, নানা বাসনার ফলে মানুষ যে সুখ-দুঃখের সংসারে জড়িয়ে প'ড়েছে, তা হ'তে উদ্ধার পেতে হ'লে, সর্ব্বদা কায়-মন-প্রাণে ভগবানের আরাধনা করাই তার উচিত। এই ক'র্‌তে পার্‌লে, ক্রমে মন নির্ম্মল হয় এবং মৃত্যু-সময়ে ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ করার সম্ভাবনা থাকে। মৃত্যু-কালে যদি একমনে ভগবান্‌কে স্মরণ করা যায়, তবেই জন্ম-মৃত্যুর হাত হ'তে নিস্তার পাওয়া যায় ও চির-শান্তি লাভ হয়। সুতরাং শৌচ-অশৌচ সুস্থান-কুস্থান কিছু বিচার না ক'রে, যাতে তাঁর কথা মনে থাকে, সেই উপায়ই সর্ব্বদা অবলম্বন করা উচিত। এ বিষয়ের চেষ্টা তার কখনও ছাড়া উচিত নয়। নিজের প্রকৃত হিত যে চায় তাকে এ ক'র্‌তেই হবে; তবে সমাজ-ভুক্ত থাক্‌লে, ধর্ম্মের বাহিরের যে অনুষ্ঠানগুলো আছে, তা অশৌচ-সময়ে সমাজের খাতিরে বাদ দিতে পারে। আর যিনি প্রেমিক, যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি ত ইহা ছেড়ে থাক্‌তেই পার্‌বেন না, সুতরাং জোর ক'রে কোন লোকাচার বা দেশাচারের বাধ্য হওয়া তাঁর উচিত নয়।

কেশব।—বাবা, এ ত মৃতাশৌচের কথা হ'ল। আচ্ছা, সন্তানাদি হ'লে ত আনন্দই হয়, তাতে অশৌচ কেন হয়? দেব-কার্য্যাদি তাতে বন্ধ থাকে কেন?

পাগল—বুঝ্‌লি না? আনন্দেও যে মনে চঞ্চলতা আসে। চঞ্চল মনে কি সাধনা হয় রে? যে অবস্থায় ঈশ্বর-স্মরণ হয় না সেইটাই কি অশৌচ-সময় নয়? আচমনের মন্ত্র জানিস্ ত?

কেশব—আজ্ঞে, হাঁ। শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ ক'র্‌লেই ভিতর বাহির শুদ্ধ হ'য়ে যায়।

পাগল—ছেলে মেয়ে জন্মিলে অজ্ঞানী সংসারী মানুষ আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ভগবান্‌কে একেবারে ভুলে যায়, ঐ আহ্লাদেই মেতে থাকে, ভগবান্‌কে মনে ক'র্‌তে পারে না, তাঁতে মন বসাতে পারে না, তাই তখন তার অশৌচ। তাঁকে ঠিক্ ঠিক্ মনে ধারণা ক'র্‌তে পার্‌লে—অশৌচ—অপবিত্রতা কোথায় থাকে? এই জন্যই যে ভগবান্‌কে ও সময় ভুলে যায় তার অশৌচ হয়, তার দেব-কার্য্য নিষেধ। এখানেও তত্ত্বজ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্তের জন্য ও আইন নয়।

কেশব।—এ পর্য্যন্ত বেশ বুঝ্‌লাম, বাবা। কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের অশৌচ অন্ত হ'তে কম বেশী সময় দেওয়া হ'য়েছে কেন? আর ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনের পর কি তাদের অশৌচ সত্য সত্যই যায়?

পাগল।—ভিতরের অশৌচের কথা আগেই ব'লেছি। গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের অশৌচ-সময়ের কম বেশী করা হ'য়েছে। এখন ভগবান্ চারি বর্ণ কেমন ক'রে ভাগ ক'রেছিলেন, তা শোন্।

তিন প্রকার গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। (১) সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, অতএব প্রকাশক। এই গুণ-যুক্ত মানুষ আপনাকে সুখী এবং জ্ঞানী ব'লে অভিমান করে। যে সময় এই গুণ বাড়ে সেই সময় সকল ইন্দ্রিয়ে

জ্ঞান-রূপ প্রকাশের অনুভব হয় এবং মানুষ বেশ শান্ত ও স্থির থাকে। তখন ভগবানের ভজন করা, সকলের প্রতি দয়া করা, পরের উপকার করা, খারাপ ইন্দ্রিয়-সুখে মত্ত না হওয়া, এই সব ভাল কাজ লোকে করে; তাদের বিষয়ে আসক্তি থাকে না। এই গুণের ফলে মানুষের ঊর্দ্ধ লোকে গতি হয়। এই গুণে থাকা সময়ে যদি কেউ মরে, তবে সগুণ পরমেশ্বরের উপাসকেরা যে সুখময় লোকে গমন করে, সে সেই লোকে যায় ও আনন্দ ভোগ করে। (২) রজোগুণ তৃষ্ণা বা আসক্তি হ'তে হয়। এই গুণের দ্বারা মানুষ চঞ্চল হ'য়ে আসক্তির বশে নানা কর্ম্ম করে ও বদ্ধ হয়। এ গুণ যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ ধন সম্পত্তি ইত্যাদি যা আছে তা আরো বাড়াতে ইচ্ছা করে, ভাল ঘর বাড়ী সম্পত্তি প্রভৃতি করার নিমিত্ত খুব চেষ্টা করে, 'এই ক'রেছি, এই ক'রব' ইত্যাদি নানা জল্পনা কল্পনা ক'রতে থাকে। ইহাতে থাকা সময়ে মানুষ ম'রলে আবার মানুষ হ'য়ে জন্মে। এ গুণের ফল দুঃখজনক। (৩) তমোগুণ অজ্ঞান হ'তে জন্মে। এই গুণে জীবের মোহ জন্মায় এবং ইহার ফলে জীব ভ্রম আলস্য নিদ্রাদি দ্বারা বদ্ধ হয়। এ গুণ বাড়্‌লে মানুষের বিবেক নষ্ট হয়, কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তার বিচার থাকে না। ইহাতে থাকা সময়ে ম'রলে পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা ইত্যাদি হ'য়ে জন্মিতে হয়।

এই তিন গুণ সকলের মধ্যেই আছে; কেবল সত্ত্ব, কেবল রজঃ বা কেবল তমোগুণ কারো মধ্যে আছে, এমন হ'তে পারে না। তবে যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় তখন রজঃ ও তমোগুণ খুব দুর্ব্বল হ'য়ে থাকে, রজোগুণ বাড়্‌লে সত্ত্ব ও তমোগুণ কম হ'য়ে থাকে আর তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে সত্ত্ব ও রজোগুণ দুর্ব্বল হ'য়ে যায়।

ভগবান্ এই তিন গুণ ও তার প্রধান মিশ্রণ দেখে মানুষের চারিটী শ্রেণী ভাগ ক'রেছিলেন :— (১) যাঁদের সত্ত্বগুণ প্রবল (রজঃ ও তমোগুণ খুব কম), তাঁদিগকে ভগবান্ এক শ্রেণীতে ফেলেছিলেন,

তাঁরাই হ'য়েছিলেন ব্রাহ্মণ। যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম নিজেরা করা ও অন্যকে করান, বেদাদি নিজে পাঠ করা ও অন্যকে পাঠ করান, নিজে দান গ্রহণ করা ও অন্যকে দান করা, এই ছয়টী কর্ম্ম নিজের স্বভাব অনুসারেই এঁরা ক'র্‌তে ভাল বাস্‌তেন ও ক'র্‌তেন। ধর্ম্ম কর্ম্ম ও বেদ-পাঠ ইত্যাদি এবং সমাজের ও দেশের কিসে ভাল হয় সেই চিন্তা নিয়েই সর্ব্বদা থাক্‌তে ভাল বাস্‌তেন ব'লে এঁরা অন্য লোকদিগকে যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কার্য্য করাতেন এবং বেদ-পাঠাদি করাতেন (বিদ্যা শিক্ষা দিতেন)। এই সকল কাজ ক'রে তাঁরা দক্ষিণা বা প্রণামী রূপে অর্থাদি পেতেন। ধনী লোকে ধর্ম্ম কার্য্য বা কোন সামাজিক ব্যাপার ক'র্‌লে, যাঁরা সেই সব কাজে ব্রতী থাক্‌তেন তাঁদের ছাড়াও অনেক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ ক'রে টাকা পয়সা জিনিস পত্র দান ক'র্‌তেন। এইরূপে তাঁদের আর জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায়ে টাকা রোজকার ক'র্‌তে হ'ত না। এঁরা যে শুধু দান নিতেনই তা নয়, পরের দুঃখ দূর করার নিমিত্ত দান ক'র্‌তেনও। ইন্দ্রিয়গণকে এবং অন্তঃকরণকে দমনে রাখা, তপস্যা, ভিতরে ও বাহিরে পবিত্রতা, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্র-জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান অনুসারে অনুভব, পরকালে বিশ্বাস—এইগুলো তাঁদের স্বভাবতঃই প্রবল ছিল। মোট কথা, ব্রাহ্মণের জীবন ভোগ-সুখ আদৌ চাইত না, ভগবান্‌কে লাভ করার জন্য অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে ধর্ম্মের সুপবিত্র পথে চলা আর দেশের ও সমাজের হিত করা, এই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। তাই তাঁরা স্ব-ইচ্ছায় দরিদ্র হ'লেও লোকে তাঁদের এত আদর ও সম্মান ক'র্‌ত।

(২) যাঁদের সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজোগুণ অনেকটা বেশী ছিল (তমোগুণ খুব কম ছিল), তাঁরাই প'ড়েছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং তাঁরাই হ'য়েছিলেন ক্ষত্রিয়। যজ্ঞাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিজে করা, বেদাদি নিজে পড়া (বিদ্যা শিক্ষা করা), যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করা এবং দান, এইগুলো

তাঁরা ভালবাস্‌তেন ও ক'র্‌তেন। তাঁদের শারীরিক বল ও রজোগুণের চঞ্চলতা বেশী ছিল ব'লে তাঁরা শুধু ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও বিদ্যা-চর্চ্চা নিয়ে থাক্‌তে পার্‌তেন না। অন্য দেশের শত্রুদের হাত হ'তে নিজের দেশ রক্ষা করা, দেশে দুষ্ট লোকদের শাসন ক'রে ভাল লোকদের রক্ষা করা, রাজ্যশাসন করা ও প্রজাদের নিকট থেকে কর আদায় করা এ সবও তাঁরা ক'র্‌তেন। আয়ের কতকটা তাঁরা প্রজার হিতের জন্য ব্যয় ক'র্‌তেন আর কতকটা দ্বারা নিজের সংসারের খরচ চালাতেন। তাঁরা রাজত্ব ক'র্‌তেন বলায় এ কথা মনে ক'রো না যে, ক্ষত্রিয় মাত্রেই রাজা হ'তেন; কেহ কেহ রাজা হ'তেন, অনেকে সেনা সেনাপতি ইত্যাদি হ'তেন, অনেকে বিচার-পতি কেরাণী হিসাব-রক্ষক প্রভৃতি হ'তেন। প্রজাদের যাতে সুখ-সুবিধা হয় তাঁরা যে শুধু এমন কাজেই দান ক'র্‌তেন, তা নয়, নিঃস্বার্থ ব্রাহ্মণ-দিগকেও দান ক'র্‌তেন, নিজেরা (অভাব না থাকায়) কারো দান নিতেন না। রজোগুণ যথেষ্ট থাকায় (সত্ত্বগুণও অনেক পরিমাণে তার সঙ্গে মিশাল থাকায়) পরাক্রম, গর্ব্ব, ধৈর্য্য, কার্য্যে নিপুণতা, যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া, দান, শাসনের ক্ষমতা—এইগুলো ছিল তাঁদের স্বভাব।

(৩) যাঁদের রজোগুণ ও তমোগুণ বেশী ছিল (সত্ত্বগুণ কম ছিল) তাঁরাই প'ড়েছিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে এবং তাঁরাই হ'য়েছিলেন বৈশ্য। রজঃ ও তমোগুণের প্রবলতা-বশতঃ তাঁরা আত্ম-তত্ত্বের দিকে তেমন ঝোঁক দিতে পার্‌তেন না। তাঁদের বুদ্ধি কিছু স্থূল ও চঞ্চল ছিল ব'লেই স্থূল জগতের বিষয়েই তাঁদের বেশী মনোযোগ ছিল। তাই তাঁরা ধর্ম্ম-কার্য্যে ও বিদ্যায় অল্প মনোযোগ দিতেন; কৃষি, বাণিজ্য, গো-পালন, সুদে টাকা ধার দেওয়া ইত্যাদি নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাক্‌তেন। এই ছিল তাঁদের স্বাভাবিক কর্ম্ম। চিন্তা ক'রে দেখ এঁদের কর্ম্মগুলোই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজের ভরণ-পোষণ ক'র্‌ত।

(৪) যাঁদের তমোগুণ ছিল বেশী (সত্ত্ব ও রজোগুণের ভাগ খুব

কম), সুতরাং ধর্ম্ম-বিষয়ের জ্ঞান এবং কর্ম্ম-বিষয়েও আবশ্যকীয় জ্ঞানের অভাব ছিল, তাঁরাই প'ড়েছিলেন চতুর্থ শ্রেণীতে এবং তাঁরাই হ'য়েছিলেন শূদ্র। তমোগুণের কার্য্য অজ্ঞানতা। অজ্ঞানী নিজের বুদ্ধিতে কোন হিতকর কাজ ক'র্‌তে পারে না। তাই অপর তিন বর্ণ যেমন নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে সমগ্র-সমাজরূপ বিরাট—পুরুষের সেবার নিমিত্ত নানা কাজ ক'র্‌তেন, এঁরা তা ক'র্‌তে পার্‌তেন না। সেই জন্য অন্য তিন বর্ণের লোকে অল্প বুদ্ধির সামান্য সামান্য কাজ ক'র্‌তে এঁদিগকে ব'ল্‌তেন, কারণ তাতে তাঁদের বড় বড় কাজগুলো করার অনেক সময় পেতেন এবং কাজেরও সুবিধা হ'ত। কাজেই দেখ, প্রকৃত পক্ষে শূদ্রেরা সমাজ-সেবারই সাহায্য ক'র্‌তেন। সুতরাং তাঁরাও সমস্ত সমাজেরই সেবক; ব্যক্তি বিশেষের বা সমাজ বিশেষের সেবক ছিলেন না। যা হোক অন্য তিন বর্ণের অধীনে থেকে তাঁদের আদেশ মত কাজ ক'র্‌তেন ব'লে বলা হয়, শ্রেষ্ঠ তিন বর্ণের পরিচর্য্যা বা সেবাই শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম। বস্তুতঃ অপর তিন বর্ণও নিজ নিজ স্বভাব ও বুদ্ধি অনুসারে যে সব কর্ম্ম ক'র্‌তেন তাও সমাজেরই সেবা। আমি যে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি এটা কি তোমাকে সেবা করা হ'চ্ছে না? কারো সুখ-শান্তি বিধান করাই তার সেবা। অপর তিন বর্ণ যে শূদ্রদের প্রতিপালন ক'র্‌তেন, সেটা কি শূদ্রদের সেবা নয়? পিতামাতা যে সন্তানকে লালন পালন করেন, সেটা কি সন্তানের সেবা নয়?

এই সরল সত্য ভুলে যাওয়ায় যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'য়েছে। চারি বর্ণই বিরাট সমাজ-রূপ দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। সকলেই নিজ নিজ গুণ ও শক্তি অনুসারে সেই বিরাটরূপী ভগবানেরই সেবা ক'র্‌ছে ও ক'র্‌বে। এর মধ্যে কোন অঙ্গেরই অধিকার নাই যে, অন্য অঙ্গকে ঘৃণা ক'র্‌বে ও তার উপর অত্যাচার ক'র্‌বে। মানুষের দেহের মধ্যে মাথা পায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাই ব'লে মাথা যদি পা'কে ঘৃণা করে, তার যত্ন না করে অর্থাৎ

তার কোন কষ্ট বা কোন ব্যাধি হ'লে তার শান্তির জন্য বুদ্ধি না খাটায়, আর তাকে নানা রকমে যন্ত্রণা দিয়ে অচল ক'রে তোলে, তবে তাতে দেহেরও ক্ষতি এবং মাথারও ক্ষতি, এ কথার ভুল কি আছে? যার পা নাই সে জানে যে, অন্যান্য অঙ্গ সুস্থ থাকৃতেও তার কতখানি অসুবিধা ও কষ্ট। সমাজ সম্বন্ধেও আমাদের এ কথাটা তলিয়ে বুঝা উচিত।

এখন অশৌচের কালের পরিমাণ সম্বন্ধে ব'ল্‌ছি, শোন। দক্ষ-সংহিতায় অশৌচের ব্যবস্থা এই প্রকার দেওয়া আছে :— (১) যে ব্যক্তি সঙ্কল্প, রহস্য ও শিক্ষা—কল্প-আদি ছয়টী অঙ্গের সহিত বেদ পাঠ ক'রে তার অর্থ বুঝেছেন আর সেই অনুসারে কাজ করেন, সে ব্যক্তির সদ্য অশৌচ অর্থাৎ স্নান ও আচমন ক'র্‌লেই তাঁর অশৌচ যায়। (২) যে বিপ্র (অর্থাৎ যাঁর উপনয়ন হ'য়েছে ও যিনি বেদ পাঠ ক'রেছেন) বেদ ভাল জানেন এবং প্রত্যহ হোম করেন, তাঁর অশৌচ একদিন। (৩) যিনি তাঁহা অপেক্ষা বেদ কম জানেন এবং হোম তাঁহা অপেক্ষা কম করেন, তাঁর তিন দিন অশৌচ হয়। (৪) ঐ দুই বিষয়ে যিনি আরও কম, তাঁর অশুচ চারি দিন। (৫) ঐ দুই বিষয়ে যিনি তাঁর চেয়েও অধম, তাঁর অশুচ ছয় দিন। (৬) যে ব্যক্তি জাতি-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কুলে জন্মেছে মাত্র কিন্তু যথা-নিয়মে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে না, তার অশুচ দশ দিন। (৭) জাতি-ক্ষত্রিয়ের অর্থাৎ যে ক্ষত্রিয় কুলে জন্মেছে মাত্র কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তা করে না, তার অশুচ বার দিন। (৮) জাতি-বৈশ্যের অর্থাৎ বৈশ্য কুলে জন্মেছে মাত্র কিন্তু বৈশ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে করে না, তার অশুচ পনর দিন। (৯) শূদ্রেরা একমাসে শুদ্ধ হয়। আর (১০) যে ব্যক্তি চিররোগী, যে কৃপণ, যে মূর্খ, যে স্ত্রীর বাধ্য, যে সর্ব্বদাই পরাধীন, যে চিরদিনই ঋণে বদ্ধ, যে আত্মার বন্ধন মোচনের জন্য কোন ক্রিয়া করে না, যে মদ্যপান মৃগয়া ইত্যাদি কাজে আসক্ত, যে বেদ পড়ে না—এই সকল লোকের প্রত্যেকেরই অশৌচ মরণ পর্য্যন্ত থাকে

অর্থাৎ এরা এক দিনের জন্যও শুচি নয়, চিরদিনই অশুচি। গুণের কম বেশী অনুসারে এই মত অশৌচের ব্যবস্থা হ'য়েছে।

উপরের কথাগুলো বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে, শাস্ত্রে গুণ অনুসারে যে অশৌচের ব্যবস্থা দিয়েছে, তা এখন চলিত নাই। এখন সমাজে দশ দিন, বার দিন, পনর দিন আর এক মাসের অশৌচ বাঁধা বাঁধি ভাবে চ'ল্‌ছে। বাঁকী ছয় রকম অশৌচের কোন খবরই নাই। যদিও কোন কোন অবস্থায় সন্ত অশৌচ বা ত্রিরাত্রি অশৌচের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেটাও মামুলি ধরণের, যার অশৌচ হ'ল তার গুণের উপর নির্ভর ক'রে নয়। কিন্তু সত্য কথা ব'ল্‌তে গেলে ব'ল্‌তে হয়, ঐ যে শেষ নম্বরে যেটা বলা হ'য়েছে, ঐটাই এখন বোধ হয় সাড়ে পনর আনা লোকের পক্ষে খাটে, অর্থাৎ চির জীবন অশৌচ। বেদ বেদান্ত সব উড়ে গিয়েছে। যদিও দুই চারিজন ওর আলোচনা করে দেখা যায়, তা হ'লেও সেটা কেবল মুখে মুখে, কাজে কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না; সুতরাং গুণ অনুসারে অশৌচের ব্যবস্থা আর খাট্‌বে কেমন ক'রে? লোকে কেবল খুঁজ্‌ছে দুনিয়ার সুখ কিসে পাবে, তার জন্য নরকে যেতে হয় তাতেও প্রস্তুত। কাজেই তাদের আর গুণের দিকে তাকাবার অবসর কোথা? তবে সমাজে দুটা চার্‌টা নিয়ম না মান্‌লে চলে না, তাই মামুলি নিয়ম গোটা কত বেগার শোধ দিবার মত লোকে মেনে থাকে। আর যাদের বাস্তবিকই বোধ-শক্তি নাই, তারা হয় ত নরক ভোগ ক'র্‌তে হবে, এই ভয়ে মানে।

অতএব, দেখ নিয়মিত দিনেই অশুচ সত্য সত্য যায় না। যে পর্য্যন্ত মানুষ শোক ভুলে আত্মস্থ হ'তে না পারে, ততদিন প্রকৃত পক্ষে সে অশুচি থাকে। রাজসূয় যজ্ঞের অনেক দিন পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, কুরুক্ষেত্রে যে সব আত্মীয় স্বজন মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের কথা মনে ক'রে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব'লেছিলেন যে, এত যাগ যজ্ঞ ক'রেও তাঁর

শোক দূর হ'চ্ছে না। তা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছিলেন, "মহারাজ, আপনার অশৌচ ত যায় নাই। এতদিনেও যখন শোক ভুল্‌তে পার্‌লেন না, তখন আর শুচি হ'লেন কেমন ক'রে?" মনের শুচি ভাব অর্থাৎ প্রশান্ত অবস্থা না এলে অশৌচ যায় না। কাজেই যার তত্ত্বজ্ঞান যত বেশী. সুতরাং যার মনের প্রশান্ত ভাব যত শীঘ্র আসে, তার অশৌচ তত কম দিন থাকে। কিন্তু প্রকৃত ভাবে বুঝে চ'ল্‌বার মত লোক কয়জন আছে? তাই মুনি ঋষিরা সূক্ষ্ম বিচার ক'রে যে ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন, তারই কতকটা নিয়ে সমাজে ব্যবহারিক ভাবে একটা অশৌচ হওয়া এবং অশৌচ দূর হওয়ার প্রথা পালন করা হয় মাত্র। বাস্তবিক ধর্ম্মঅনুষ্ঠানের পক্ষে ঐ সূক্ষ্ম বিচারের ব্যবস্থাই ধরা উচিত অর্থাৎ ব্যবহারিক ভাবে অশৌচ গেলেও যদি মনে শোক বা আনন্দের চঞ্চলতা থাকে, তবে সে সময়ের অনুষ্ঠান ঠিক মত হয় না; আবার ব্যবহারিক ভাবে অশৌচ না গেলেও প্রকৃত জ্ঞানের প্রভাবে যদি প্রাণে শান্তি এসে থাকে, তবে সে সময় অনুষ্ঠান ক'র্‌লে ঠিক মতই হ'য়ে থাকে, জান্‌বে।

"এখন আসি" ব'লে পাগল ছুটে চ'লে গেল। কেশব তার প্রণাম করারও সুযোগ পেল না।

পঞ্চম রাত্রি।

জাতি-ভেদের কথা।

—:*:—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ—কর্ম্ম—বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।১৩

গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। এইগুলি সৃষ্টি করিলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়াই জানিবে, কারণ আমি অব্যয়। অর্থাৎ যাহার যেমন গুণ ও কর্ম্ম তাহাকে সেইরূপ শ্রেণীর মধ্যেই ফেলিয়াছি, ইহাতে আমার কোন লাভালাভ বিচার, পক্ষপাতিত্ব, ইচ্ছা বা আসক্তি নাই।

কেশব বাবাজি তিন চার মাসের মধ্যে আর গুরুদেবের সাক্ষাৎ না পেয়ে মাঝে মাঝে প্রাণে বড়ই যাতনা অনুভব করে। মনকে সে কত প্রবোধ দেয়, 'গুরুদেব ত ব'লেছেন, তিনি আমার মধ্যেই আছেন, আমার আশে পাশেও র'য়েছেন, আমার আত্মারূপেই তিনি বিরাজ ক'র্‌ছেন, কিন্তু তবু তাঁর, রূপখানি দেখ্‌বার জন্য প্রাণ আকুলি বিকুলি করে কেন? মন, শান্ত হও। তাঁর কথা বুঝ, তাঁর প্রত্যেক কথা বেদ-বাক্য। বিশ্বাস কর, শান্ত হও।' মন তা মানে না। তাত্ত্বিক হিসাবে কথাটা ঠিক হ'লেও, যে দেহ অবলম্বন ক'রে আত্মা নিজ স্বরূপ ও নিজ লীলা-রহস্য-রূপ জগৎ-রহস্য বুঝাচ্ছেন, সে দেহটাই বা কম প্রিয় হবে কেন? যতক্ষণ জগতে 'আমি তুমি' ব্যবহার আছে ততক্ষণ ওটা

হওয়া স্বাভাবিক এবং গুরুর জন্য প্রাণের এই ব্যাকুলতায় শিষ্যের মঙ্গলই হ'য়ে থাকে।

ফাল্গুন মাস। এক দিন, রাত্রি প্রায় বারটার সময়, কেশব বাবাজি একটী রোগীর শুশ্রূষা ক'রে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হ'তে আখড়ায় ফিরে আস্‌ছে, তখন হঠাৎ মাঠের মধ্যে দূর হ'তে একটী লোক আস্‌ছে ব'লে তার অনুমান হ'ল। মূর্ত্তিটী কিছু দূর অগ্রসর হ'লে জ্যোৎস্নার আলোকে কেশবদাস দেখ্‌ল এটী তারই হৃদয়ে শান্তি-জল ঢালে এরূপ মেঘ—এ তারই গুরুদেব। কেশবের পা আর চ'ল্‌ল না—ক্ষণকাল পটে আঁকা পুতুলের মত থেকেই—যেন অজ্ঞাতসারে কেশব এগুয়ে চ'ল্‌ল। অর্দ্ধ পথে চাষ করা জমির ভিতরে যেমন সাম্‌না সাম্‌নি হওয়া অমনি সে ভক্তি-ভরে গুরুর চরণে লুটিয়ে পড়্‌ল। গুরুদেবের পদ্ম-হস্ত কেশবের মস্তক হ'তে পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে পরিচালিত হওয়ায়, তার দেহের প্রতি লোম-কূপে এক অজানা অমৃত-ধারা ছড়িয়ে গেল। পাগল কেশবের হাত ধ'রে তুলে ব'ল্‌ল, "আয়, রাস্তা ছেড়ে দূরে ঐ মাঠের ভিতর ব'সে কথাবার্ত্তা বলা যাক্।"

পাগল চ'লেছে, কেশব পিছনে পিছনে যাচ্ছে। অতি দূরে মাঠের মাঝখানে গিয়ে দু'জনেই ব'স্‌ল। চারদিকে যতদূর দেখা যায়, দূরে গাছপালা-ঢাকা গ্রামগুলো নীল আকাশের তলে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে কেবল মাঠ, জনপ্রাণীর সমাগম নাই—জ্যোৎস্না যেন রূপার তরল ধারার মত সব ছেয়ে র'য়েছে।

পাগল।—দিন কেমন যাচ্ছে? আর কিছু জান্‌তে চা'স্?

কেশব।—আজ্ঞে, বাবা, খুবই আনন্দে আছি। মাঝে মাঝে দুঃখ আসে, সে আর কিছুরই দুঃখ নয়, আপনাকে যে দেখ্‌তে পাইনা এই দুঃখ।

পাগল।—যাকে ভালবাসা যায় তার জন্য প্রাণটা এমনই করে।

তা আমি ত তোকে ছাড়া নই, আমি ত তোর মধ্যেই আছি, তবে আর দুঃখ কি রে? আচ্ছা, কিছু জান্‌তে চা'স্ ত জিজ্ঞাসা কর্।

কেশব।—বাবা, সে দিন অশৌচের কথা ব'ল্‌তে গিয়ে জাতি-ভেদের প্রকৃত মূল কি তা ব'লেছিলেন। কিন্তু হিন্দু-সমাজে জাতির ত অন্ত দেখি না, আর 'ছুঁয়োনা, খেয়োনা' এটার বাড়াবাড়িও খুব দেখি। তারপর প্রায়ই দেখি কোন কাজের জন্য একজনের জাতি গেল, তখন সে সমাজের পাঁচ জনকে ধ'র্‌ল, কিছু জরিমানা দিল, হয় ত সমাজে একটা ভোজ দিল, তারপরই জাতিতে আবার উঠ্‌তে পা'র্‌ল। জাতির গিয়েছিল কি, আবার জাতিতে উঠ্‌লেই বা তার এলো কি, সেটা কিছুই বুঝা যায় না। বর্ণ-সঙ্করটা কি? সমাজে এত বর্ণ-সঙ্করের ঘটা কোথা থেকে এল?

পাগল।—সে দিন যা ব'লেছি তা যদি ভাল ক'রে বুঝে থাক, তবে খাঁটি জিনিসটা তোমাকে বুঝান বেশী শক্ত হবে না। সমাজে সচরাচর যা দেখে থাক, বিচার ক'র্‌লে ওর অনেকগুলোই টিক্‌তে পারে না, দেখ্‌তে পাবে। মানুষ বিচার ক'রে কাজ ক'র্‌তে চায় না, যেমন পাঁচ জনকে ক'র্‌তে দেখে তেমনি ক'রে যায়। কোন বিশিষ্ট কারণে হয় ত দরকার বোধে কোন লোক একটা কাজ ক'র্‌ল, তা দেখে সাধারণ লোকে ওর ভিতরকার কারণ সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার না ক'রে, বাহিরে যেটা কারণ ব'লে বোধ হ'ল, সেইটাকেই প্রকৃত কারণ মনে করে এবং মোটামুটি সেই প্রকারের অবস্থা উপস্থিত হ'লেই ঐরূপ কাজ করে।

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। একজন ভদ্রলোক একটা বিশাল মাঠের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্র। বাতাসও প্রবল-বেগে ব'চ্ছে। ভদ্রলোকটী ছাতা মুড়ি দিয়ে যাচ্ছিলেন। বাতাসের বেগে আর ছাতা রাখা যায় না দেখে, তিনি কতকদূর গিয়ে ছাতাটা বন্ধ ক'রে ফেল্‌লেন। পাশেই কতকগুলো রাখাল গরু চরাচ্ছিল। তারা দেখ্‌ল ভদ্রলোকটী

সেই ভয়ঙ্কর রৌদ্রের মধ্যেও ছাতা বন্ধ ক'রে, বগলে নিয়ে, চাদরটা মাথার উপর দিয়ে দীর্ঘ মাঠটা পার হ'য়ে গেলেন। তখন তারা বলাবলি ক'রতে লাগ্ল, 'আচ্ছা, ভাই, এ লোকটা এখানে ছাতা বন্ধ ক'রে গেল কেন? বোধ হয় এখানে ভূতের ভয় আছে। ছাতা মাথায় দিয়ে গেলে বোধ হয় ভূতে অত্যাচার করে।' ঐ মাঠে ছাতা মাথায় দিয়ে গেলে ভূতে অত্যাচার করে, এইটাই তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হ'যে গেল। এর পর কোন দিন কোন লোককে ছাতা মাথায় দিয়ে সেই মাঠের মধ্যে যেতে দেখ্লে, তারা তাকে ব'লত, 'মহাশয়, আপনার ত সাহস কম নয়! এ মাঠে ভয়ানক ভূতের ভয়; কেউ ছাতা মাথায় দিয়ে গেলে তাকে মেরে ফেলে।' কাজেই ছাতা মাথায় দিয়ে কেউ আর সেই মাঠের মধ্যে যাতায়াত ক'রত না, তা রৌদ্রের মধ্যেই হোক আর বৃষ্টির মধ্যেই হোক। এইরূপে সেই মাঠে ছাতা-ব্যবহার বন্ধ হ'য়েছিল। কেউ এর প্রকৃত কারণের খোঁজ পেল না। ভূতের ভয় ছাতা-বন্ধের কারণ হ'য়ে রইল।

সে দিন ত শুনেছ, প্রথমে একটা শ্রেণী-বিভাগ গুণ ও কর্ম্ম অনুসারেই হ'য়েছিল। প্রথমে হয় চারটা ভাগ। একবার যখন ভাগ হ'য়ে গেল, তখন কাজের সুবিধার নিমিত্ত, ঐ এক এক দলের মধ্যে আরও ছোটখাট ভাগ হ'তে লাগ্ল। যেমন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ হ'লেন অধ্যাপক, ছেলেপেলেদের লেখাপড়া শিখান তাঁর কাজ হ'ল; কেউ বা পুরোহিত হ'লেন, লোকের বাড়ী জাত-কর্ম্ম চূড়াকরণ বিবাহ ইত্যাদি কাজ এবং যাগ যজ্ঞ পূজা প্রভৃতি করা হ'ল তাঁর কাজ; কেউ গুরু হ'লেন, মুক্তি লাভের জন্য লোককে সাধনা শিক্ষা দেওয়া হ'ল তাঁর কাজ। এই ভাবে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একদল শাসন-কার্য্য সম্পর্কে লেখা পড়া ইত্যাদি নিয়ে থাক্লেন, আর একদল দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ-ব্যবসায় নিয়ে থাক্লেন; বৈশ্যদের মধ্যে কেউ হ'ল তিলি (জিনিস খরিদ বিক্রয় ব্যবসা নিয়ে), কেউ হ'ল কর্ম্মকার, কেউ কুম্ভকার, কেউ মালাকার·

ইত্যাদি। দিন দিন ক্রমে আরও ভাগ হ'তে লাগ্‌ল, যেমন নাকি গাছ একটা জন্মিলে ক্রমান্বয়েই তার ডালপালা সংখ্যায় বাড়্‌তে থাকে। এখন, এক এক কাজের মধ্যে কতকগুলো ক'রে লোক থাকায় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে একই প্রকারের চলন্ ফেরন্ ও প্রবৃত্তি থাকায়, তারা ক্রমে অন্যান্য দল থেকে পৃথক্ হ'য়ে প'ড়্‌তে লাগ্‌ল। বিবাহ-ব্যাপার নিজ দলের মধ্যে ভিন্ন অন্য দলের সঙ্গে বন্ধ হ'য়ে গেল। এই প্রকারে হিন্দু-সমাজে কালক্রমে বহু জাতির উৎপত্তি হ'য়ে গিয়েছে। বহু জাতি হ'লেও মূলে কিন্তু চারবর্ণ বা আসল জাতি জান্‌বে।

'ছুঁয়োনা, খেয়োনা' এই যা দেখ্‌ছ, এটাও অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ির ফলে হ'য়েছে। 'ছুঁয়োনা, খেয়োনা' এটাও হবার একটা বিশিষ্ট কারণ ছিল, কিন্তু সেটা এখন লোকে ভুলে গিয়েছে। যে উদ্দেশ্যে এটা করা হ'য়েছিল, সে উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করার কথা ভুলে গিয়ে লোকে কেবল সেই অচারটা আঁক্‌ড়ে ধ'রে আছে আর সেই আচারের ভিত্তি হ'য়েছে ঘৃণা ও হিংসা।

প্রথমে ছোঁয়ার কথা দেখা যাক্। যে, যে গুণের লোক, তার ভিতর থেকে সেই গুণের শক্তিই বাহির হয়। কাজেই, যে অল্প সত্ত্বগুণের লোক, সে যদি বেশী রজোগুণের লোককে স্পর্শ করে, তবে তার ভিতরে রজোগুণ এসে প'ড়্‌বে, তার সত্ত্বগুণ আরো কমে যাবে। আবার যে অল্প রজোগুণের লোক, সে যদি বেশী সত্ত্বগুণের লোককে স্পর্শ করে, তবে তার ভিতরে সত্ত্বগুণ এসে প'ড়্‌বে, তার রজোগুণ আরো কমে যাবে। মানুষকে সত্ত্বগুণী হ'তে হবে যদি সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হ'তে চায়। তারপর যদি সে গুণাতীত হ'তে পারে তবে ভগবানের সঙ্গে তার মিলন হবে। এই ভাবটীর উপর লক্ষ্য ক'রে কা'কে ছুঁতে দেওয়া উচিত, আর কা'কে ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়, সেটা বিচার ক'র্‌বে। এখন তা নাই; কেবল কে উঁচু কুলে জন্মেছে আর কে নীচ

কুলে জন্মেছে, সেই নিয়ে, গুণ নাশ বা বৃদ্ধির বিচার নয়, মান অপমানের এবং পবিত্র বা অপবিত্র হওয়ার বিচার হয়। সাধন নাই, ভজন নাই, ভগবানের কোন ধার ধারে না, কেবল অমুক ছোট জাতির লোক ছুঁয়েছে, তার চৌদ্দ পুরুষের বাপান্ত ক'র্‌তে হবে, আর জলে ভাল ক'রে ডুবিয়ে এসে তবে শান্তি! তাতেও শান্তি নাই, এই ছোঁয়া-রূপ অপরাধের জন্য বিশেষ শাস্তি দিতে পার্‌লে তবে শান্তি! আরে বাপু, যদি সত্য সত্যই সরল-প্রাণে সাধনা ক'র্‌তে থাক, তবে সাধন অবস্থায় গুণের দিকে দৃষ্টি রেখে ছোঁয়ার কথা বিচার ক'র্‌বে, শুধু জাতির দিকে তাকিয়ে নয়। তার পর যখন সিদ্ধিলাভ ক'র্‌বে, যখন গুণাতীত হবে, তখই সর্ব্বত্রই ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাবে। তখন ছোঁয়া ছুঁইয়ের কোন বিচার দরকার হবে না—বিচার ক'র্‌তেও পার্‌বে না, কারণ তখন সবই যে ভগবান্ ব'লে দেখ্‌বে ('যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে')।

কেশব।—কি সর্ব্বনাশ! শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কোথায় ডুবে গিয়েছে? আচ্ছা, বাবা, আজ কাল অস্পৃশ্যতা উঠিয়ে দিবার জন্য একটা ভারী আন্দোলন চ'ল্‌ছে। এটা কি ভাল না মন্দ?

পাগল।—দেখ, বাবা, এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায় না। অবস্থাটা খুলে ব'ল্‌লে এটা ভাল কি মন্দ তা তুমি নিজেই বুঝতে পার্‌বে। সমগ্র সমাজের হিতের জন্য যারা অতি নিন্দিত কাজ ক'র্‌ছে (যেমন—মেথর, চামার মুর্দ্দাফরাস ইত্যাদি), তা'দিগকে অতি হীন অবস্থায় ফেলে রেখে, চিরকাল দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে রাখাও একটা মহাপাপ। যদি কখনো এমন ঘটনা হয় যে, ওরা ঐ সব কাজ না ক'রে হাত পা গুটিয়ে বসে, তখন সমাজে যাঁরা বড় ও মাঝারি আছেন, তাঁদের নিজেদেরই কি ঐ সব কাজ ক'র্‌তে হবে না? মেথরের কথা ধর। সহর বাজারে বহু দূর পর্য্যন্ত ঘন বসতি থাকায়, মল দূরে ফেলে আস্‌বার জন্য মেথরের দরকার হয়; কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ফাঁকা মাঠ আদি যথেষ্ট আছে ব'লে

সেখানে মেথরের দরকার হয় না। তা হ'লেও কেউ যদি ব্যারামে চ'ল্‌তে অক্ষম হয়, তবে তার মল আত্মীয় স্বজনেই বহন ক'রে ফেলে। তাতে কি তারা ঘৃণার পাত্র হয়? ছোট ছেলেমেয়েদের মল বাপ্ মা বোনেরাই অনবরত ফেল্‌ছেন, তাতে কি তাঁরা মেথর হ'য়ে যাচ্ছেন? জেলের (ধীবরের) জল খেতে নাই। তার অপরাধ,—সে মাছ মারে অর্থাৎ জীব-হিংসা করে। মাছ যদি কেউ না খায়, তবে জেলে মাছ মার্‌বে কেন? সে মাছ খায় সে শুদ্ধ, সে মাছ মারে সে অশুদ্ধ! মনু কিন্তু বলেন, যে মাছ খায় তারও মাছ মারার পাপই হয়।* যারা মরা ব'য়ে নিয়ে যায়, পোড়ায়, তাদের জাতি যায় না, আর যারা শ্মশানে কাঠ যোগাবে তারাই অস্পৃশ্য! মুচীর অপরাধ,—তারা চামড়ার কাজ করে। তোমরা জুতা পায় দিও না, খোল-ঢোলক-ডুগি-তবলা-ঢাক বাজিও না, চামড়ার কাজের দরকার হবে না, মুচীও থাক্‌বে না। ঠাকুর-ঘরে খোল ও ঢাক রাখ্‌তে পার, কিন্তু তা যারা তৈয়ার ক'রেছে, তারা ঠাকুর ঘরে যেতে পার্‌বে না। যুক্তি,—ঐ সব লোক অপরিষ্কার থাকে, ধর্ম্ম কর্ম্ম করে না, সেই জন্য অনধিকারী। কথাটা খুবই সত্য; যাদের আচার-ব্যবহার কথা-বার্ত্তা এবং মনের ভাব সকলই মন্দ তারা অনধিকারী। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাদের কি ভাল হবার কোন সুবিধা দেওয়া হ'য়েছে? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ত দূরের কথা, যে পরিমাণ অর্থ হ'লে পেট ভ'রে দুবেলা খাবার ব্যবস্থা ক'র্‌তে পারে, তা'ও কি তা'দিগকে দেওয়া হয়? ধর্ম্ম-কর্ম্ম তারা ক'র্‌বে কি? তা'দিগকে সে সব ত শিখান হয়ই না, উপরন্তু তারা যদি কোন রকমে শিখ্‌তে চেষ্টা করে, তবে স্মৃতি-শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তা'দিগকে বাধা দেওয়া হবে; যদি কোন ব্যক্তি তাদের দুঃখে কাতর হ'য়ে তা'দিগকে এ সব শিখাবে, তবে সে সমাজে যায়গা পাবে না, সে পতিত হবে। সুতরাং অনধিকারী হওয়াটা

* মনু সংহিতা ৫।৫১।

কি তাদের অপরাধে হ'য়েছে, না সমাজের উঁচু জাতি ও ধনী লোকদের অত্যাচারের ফলে হ'য়েছে ?

যে সব স্মৃতি-শাস্ত্রে লিখ্‌ল, সকল প্রাণীতে ভগবান্‌ দর্শন করাই মুক্তি লাভের, ভগবান্‌কে পাওয়ার একমাত্র উপায়, তাতেই লিখ্‌ল, ঐ মানুষগুলোর উপর এরূপ অবিচার কর, এমন সব কৌশল কর যাতে তারা কোন দিনই আর উঠ্‌তে না পারে! বেশ ধর্ম্ম! যদি বল, সমাজের সুবিধার জন্যই এ সব ক'র্‌তে হয়, তবে পালা ক'রে নেও না কেন, বাবা? কতককাল ওরা এই রকম ক'র্‌বে, আবার কতককাল ওদিগকে তোমাদের সুখ-সুবিধা দিয়ে তোমরা তাদের কাজগুলো ক'র্‌বে, এই নিয়ম কর না ?

যদি বল, অস্পৃশ্যেরা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম-ফলে শাস্তি ভোগ করার নিমিত্তই ঐ সব নীচ কুলে জন্মেছে, ওদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করাটা ভগবানের বিচারের বিরুদ্ধে কাজ করা, এতে পাপ হয়। তা হ'লে এই প্রকারের একটা যুক্তি দিয়ে কয়েকটা কথা তোমাদের বিরুদ্ধে বলি, দেখ ত তোমাদের প্রাণে কেমন লাগে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের লোকের মধ্যে ত ব্যাধি পীড়ায় বহু লোক ভোগে। ব্যাধিতে কষ্ট পাওয়া, এটাও ত বিনা পাপে হয় না। সুতরাং রোগ-যন্ত্রণার সময় ঐ সব লোকের সেবা শুশ্রূষা করা উচিত নয়, যদি কেহ করে তবে তার পাপ হয়, এ কথা বলা যেতে পারে। আবার ঐ সকল রোগীর মধ্যে অনেকে গরিব ব'লে টাকা খরচ ক'রে চিকিৎসা করা'তে পারে না, সরকারী ডাক্তার-খানায় গিয়া বিনা পয়সায় চিকিৎসা করায়। এটাও ক'র্‌তে দেওয়া উচিত নয়, কেন না ঐ যুক্তি অনুসারে এটাও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা হয়। এই প্রকার, কোন ব্রাহ্মণ নিতান্ত গরিব ব'লে ছেলের উপনয়ন দিতে পার্‌ছেন না, তাঁকে ঐ কাজের জন্য টাকা পয়সা দেওয়া উচিত নয় বলা লাগে, কেন না পাপের ফলেই তিনি গরিব

হ'য়েছেন। বিদ্যালয়ে ঐ তিন বর্ণের নিতান্ত গরিব ছেলেদের বিনা বেতনে পড়তে দেওয়া বা তা'দিগকে কারো বাড়ীতে রেখে খরচ না নিয়ে খেতে দেওয়া কিংবা বই কাগজ আদি দিয়ে সাহায্য করা উচিত নয়, কেন না পাপের ফলেই তারা গরিব হ'য়েছে। এই রকমের অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু, বাবা, তোমাদের যত রকমের অন্যায় যুক্তি, তা খাট্‌বে কেবলি পরের বেলায়, যারা নাকি নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে প'ড়ে আছে।

কেবল ফাঁকিবাজি, মুখে যুক্তি ও ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া আর ভিতরে নিজের সুখ ও সম্মানের চিন্তা! এতে কি চলে, বাবা? এর ফলেই ত সমাজ এত দুর্ব্বল, ভগবানের অসন্তুষ্টিতে এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা ভোগ! এর জন্যই ত 'ভগবান্, ভগবান্' ক'রে এত চেঁচিয়ে, এত লাফালাফি ক'রে, এত জাঁক-জমকে পূজা আদি ক'রেও কিছু হ'চ্ছে না (১)। বহু কাল ধ'রে ভারতে এই পাপের বাড়াবাড়ি চ'ল্‌ছে। বৈদিক যুগে কিন্তু এ সব ছিল না; ত্রেতা যুগে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সময়ে এর সূচনা দেখা যায়। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছেলে অকালে মারা যায়; তিনি এসে সে বিষয়ে প্রতিকার ক'র্‌বার নিমিত্ত রামচন্দ্রকে ব'ল্‌লেন, প্রতিকার না ক'র্‌লে তাঁকে অভিসম্পাত দিবেন ব'লে ভয় দেখালেন। বশিষ্ট দেব ধ্যানে জান্‌তে পার্‌লেন, এক শূদ্র ভগবান্‌কে পাবার জন্য তপস্যা ক'র্‌ছে, সেই হেতু এই ঘটনা হ'য়েছে!! কাজেই, অগত্যা রামচন্দ্র সেই শূদ্রের মাথা কেটে, তবে রাজ্যের সে পাপ নিবারণ ক'র্‌লেন!! শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখের উক্তি হ'লেও, এতে সব উপনিষদের সার কথা বলা হ'য়েছে (২)। তাতে শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন, "আমি কা'রও শত্রু বা মিত্র নহি, যে আমাকে ভজে সেই আমার অতি প্রিয় হয়" (৩) "তা সে বৈশ্য শূদ্র বা স্ত্রীলোক বা অতি নীচ জাতি যাই কেন হোক না" (৪)। আর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রকে যে গ্রন্থে পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্

বলা হ'য়েছে, সেই গ্রন্থেই তাঁর এই অপূর্ব্ব বিচারের কথা লেখা হ'য়েছে! যাদের একটুও বিবেচনা-শক্তি আছে, তারা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে, এ প্রকারের গল্প কি জন্য লেখা হ'য়েছে এবং কা'রা লিখেছে।

বর্ত্তমান কালে কেউ আর নির্য্যাতন নীরবে সইতে চায় না। এখন ও সব ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না। হৃদয়কে উদার ক'র্‌তে হবে। যাদের উপর এতদিন, যে কারণেই হোক, এত অত্যাচার ক'রে ভগবানের নিকট মহা অপরাধী হ'তে হ'য়েছে, তারা যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকৃতে পারে, শিক্ষা দীক্ষা পায়, ভগবানের সাধন-ভজন ক'র্‌তে পারে, তার ব্যবস্থা ক'রে তা'দিগকে তুলে নিতেই হবে। তবে এতকালের পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হ'তে পারে। যদি এরা উন্নতি করার সুবিধা পায়, তবে ত এদের মধ্যে কে সত্ত্বগুণী, কে রজোগুণী এবং কে তমোগুণী তা জানা যাবে। নচেৎ, এরা সব তমোগুণী ব'লে চীৎকার ক'রে, এদিগকে চেপে ধ'রে নীচে হীন অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখ্‌লে, সেটা কি সুবিচার হবে, না ধর্ম্ম-সঙ্গত কাজ হবে? যারা এই মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে চেষ্টা না ক'রে কেবল এর বিরুদ্ধে চেঁচাচ্ছে, দুটা চারটা অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক দেখিয়ে ন্যায়ের ফাঁকি ঝাড়্‌ছে, তারা মানুষ-নামের যোগ্য নয়।

অবশেষে আর একটা কথা বলাও বিশেষ দরকার মনে করি। যা'দিগকে এতদিন অস্পৃশ্য ক'রে রাখা হ'য়েছে, তা'দিগকে যেমন তুলে নিতে হবে যে, তাদের গুণ এবং কর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত ও পবিত্র হওয়া চাই, সমস্ত সুখ ও শান্তির নিদান যে জ্ঞান ও ভক্তি তা ক্রমশঃ তাদের হৃদয়ে বিকশিত হওয়া চাই, সদাচার ক্রমশঃ অভ্যাস করা চাই, যাতে সত্যই তারা উন্নত সমাজের অখণ্ড অঙ্গ-রূপে পরিণত হ'তে পারে। নচেৎ তা'দিগকে স্পৃশ্য ক'রে নেওয়া গেল, কিন্তু কুৎসিৎ আচার আদি ও পাপ-

(১) এরূপ ধর্ম্মে কোন মতেই ফল হ'তে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত।৩।২৯।২১—২২। (২) গীতা-মাহাত্ম্য। (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯।২৯। (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৯।৩২।

প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে সমান-ভাবেই চিরদিন থেকে গেল, এ যদি হয় তা হ'লে সমগ্র সমাজ আরও কলুষিত হ'য়ে ধ্বংসের মুখে যাবে। সমগ্র সমাজের প্রত্যেকেরই চেষ্টা ক'র্‌তে হবে পূর্ণত্বের দিকে, ভগবানের দিকে অগ্রসর হ'তে, ইহাই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান নীতি।

কেশব।—ওঃ! কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! আচ্ছা, অপরের হাতে খাওয়া বা না খাওয়া সম্বন্ধে যে ভাবে আমরা এখন চলি, সেটা ঠিক কি না, তাই দয়া ক'রে বলুন।

পাগল।—হাঁ, সেটা শোন। খাদ্যের তিন প্রকার দোষ আছে; (১) জাতি-দোষ (২) স্থান-দোষ (৩) স্পর্শ-দোষ। যে সব জিনিস রজোগুণ বা তমোগুণ বৃদ্ধি করে (যেমন, মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি) সেগুলো জাতি-দোষযুক্ত খাদ্য। দুর্গন্ধ-পূর্ণ স্থানে বা যে সব স্থানে কীটাদি বহু পরিমাণে আছে, সে স্থানে যে খাদ্য থাকে, তা যদি খুব ভাল ক'রে ঢাকা না থাকে, তবে তা স্থান-দোষযুক্ত খাদ্য। যদি কোন খাদ্য দ্রব্যের (ভাত ডাল তরকারি, কাটা ফল ইত্যাদির) ভিতরে কোন ব্যক্তি হাত বা আঙ্গুল দ্বারা নাড়ে এবং সেই ব্যক্তি বিশেষ রজোগুণী বা তমোগুণী যদি হয়, তবে সে খাদ্য স্পর্শ-দোষে দূষিত হয়। [তমোগুণী লোক অবশ্য রজোগুণী কর্ত্তৃক ঐ প্রকারে ছোঁয়া খাদ্য খেতে পারে; বেশী তমোগুণী লোক অল্প তমোগুণী লোকের দ্বারা ঐ প্রকারে ছোঁয়া খাদ্য খেতে পারে এবং সকল লোকেই সত্ত্বগুণী লোকের দ্বারা ঐ প্রকারে ছোঁয়া খাদ্য খেতে পারে।] ঐ সব দোষ বিচার ক'রে, কোন্ জিনিস খাওয়া উচিত নয়, তা ঠিক করা দরকার। আজকাল প্রথম দুই নম্বরের প্রতি দৃষ্টি খুবই কম; আর তিন নম্বরেরটা হ'য়েছে এই, যদি অমুক জাতির লোক বারান্দায় উঠ্‌ল কি ঘরে গেল, তবেই সেখানকার খাদ্য নষ্ট হ'য়ে গেল—এতটা বাড়াবাড়ি! ফলে এই হ'য়েছে, কেবল জাতি-বিশেষের প্রতি ঘৃণা আর সেই হেতু ঐ অপমানিত জাতির হিংসা-

বুদ্ধি।

কেশব।—কেহ কেহ এই সকলের জন্য ব্রাহ্মণ জাতিকে দোষী বলেন।

পাগল।—গোড়ায় যেই দোষ করুক এখন সব জাতিই দোষী। নিজের সুবিধা ও সম্মানটুকু কেউ ছাড়্‌তে চায় না।

জাতি যাওয়া এবং আবার জাতিতে উঠা, এটাও এখন যা দেখ্‌ছ সে একটা ছেলেখেলা। কোন লোকের প্রতি তার সমাজের কোন প্রবল লোক বা সমাজের পাঁচজন সাধারণ লোক কোন কারণে অসন্তুষ্ট হ'ল, তখন সমাজ শুদ্ধ লোক আর তাকে নিয়ে উঠা বসা ক'র্‌বে না বা আহারাদি ক'র্‌বে না, ব'ল্‌বে 'ওর জাতি গিয়েছে'। আবার তাদেরে যদি সে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পার্‌ল ত সকলে তাকে নিয়ে আহারাদি ক'র্‌তে লাগ্‌ল, তখন তার জাতি উঠ্‌ল। এখানে গুণ ও কর্ম্মের কোনই বিচার নাই। পাঁচজনের খেয়াল মত চল, তোমার গুণ ও কর্ম্ম যতই খারাপ হ'য়ে যাক্ না কেন, তোমার জাতি যাবে না। আর, পাঁচজনের সঙ্গে যদি মিশে চ'ল্‌তে না পার, তবে তোমার গুণ ও কর্ম্ম তাদের সকলের চেয়ে ভাল হ'লেও তোমার জাতি যাবে—তোমাকে তাদের চেয়ে হীন ব'লে সমাজ থেকে দূর ক'রে দিবে। যদি বড় লোক হয়, যে অনিষ্ট ক'র্‌তে পারে, সে যা ইচ্ছা করুক, কেউ তাকে ভয়ে কিছু ব'ল্‌বে না, তার জাতিও যাবে না।

বাস্তবিক যা'তে জাতি যায় ও জাতি উঠে, সেটা কেউ তলিয়ে দেখে না। তুমি যে সমাজে আছ, সেই সমাজের যে গুণ ও কর্ম্ম, তা যদি তোমার না থাকে, তার থেকে যদি খারাপ হয়, তবে তোমার জাতি নাই জান্‌বে। তারা তোমাকে নিয়ে উঠা বসা বা খাওয়া দাওয়া ক'র্‌লে কি হবে? সত্যই তোমার জাতি গিয়েছে, আবার যখন ঐ সমাজের গুণ ও কর্ম্ম তোমার হবে, তখন তুমি ঐ জাতিতে উঠ্‌বে। আর যদি তোমার

গুণ ও কর্ম্ম, তুমি যে জাতির মধ্যে আছ, তাদের গুণ ও কর্ম্ম হ'তে ভাল হয়, তবে তুমি তাদের চেয়ে জাতিতে উঁচু, যদিও তুমি তাদের চেয়ে উঁচু জাতির সমাজে যায়গা পাবে না এবং তোমাকে তাদের জাতির মধ্যেই থাক্‌তে হবে। এখানে সাধারণ দৃষ্টিতে তুমি উপরের জাতিতে না উঠ্‌লেও বাস্তবিক তুমি উপরের জাতি হ'য়ে গেলে। এমন কি, যদি কেউ কোন কারণে নীচ জাতিতে জন্মে থাকে আর তার কোন উচ্চ জাতির গুণ ও কর্ম্ম থাকে, তবে সে সেই উচ্চ জাতি ব'লেই গণ্য হবে; আর যদি কেউ উচ্চ জাতিতে জন্মেও কোন নীচ জাতির গুণ ও কর্ম্মযুক্ত হয়, তবে সে সেই নীচ জাতির মধ্যেই প'ড়্‌বে। সমাজে যখন প্রাণ ছিল, বিচার ছিল, তখন এ সব হ'ত। এখন ও সব ধামা-চাপা প'ড়ে গিয়েছে, লোকেরা মামুলি চাল্‌চলন্ খামখেয়ালির ভাবে চালাচ্ছে। এতে সমগ্র জাতি জীবনী-শক্তি-হীন হ'য়ে প'ড়্‌ছে, আর হিংসা ঘৃণা ও বিবাদের হোটেলখানা ব'সেছে।

এখন বর্ণ-সঙ্করের কথা। এক বর্ণের পুরুষের সঙ্গে অন্য এক বর্ণের স্ত্রীলোকের সংশ্রবে, অবৈধ প্রণয়ে, যে সন্তান জন্মে তাকে বর্ণ-সঙ্কর বলে।* পুরাণে যে ভাবে বর্ণ-সঙ্করের ফর্দ্দ দেওয়া হ'য়েছে, তা কোন বিচারের ধার ধারে না। বিশেষতঃ যে সময়ে ঐ সব বর্ণ-সঙ্করের উৎপত্তি হ'য়েছে ব'লে লেখা হ'য়েছে, সে সময়ে অসবর্ণ-বিবাহ অর্থাৎ এক বর্ণের পুরুষের সঙ্গে অন্য বর্ণের স্ত্রীলোকের বিবাহ চলিত ছিল। তখন যদি এত অধিক মাত্রায় অবৈধ প্রণয়ের ছড়াছড়ি দেশে হ'য়েছিল স্বীকার ক'র্‌তে হয়, তবে তখন দেশে ঘোর অরাজকতা হ'য়েছিল এবং সমাজের শাসন মোটেই ছিল না, ব'ল্‌তে হয়। আর তা যদি হয়, তবে সমাজের সকল স্থানই কলুষিত হ'য়েছিল, এ কথা বাধ্য হ'য়ে ব'ল্‌তে হয়। আর একটী প্রশ্ন আসে, ঐ সব বর্ণ-সঙ্কর যখন হয় নাই, তখন সমাজে তাদের কাজ কে ক'র্‌ত? ঐ সব কাজ যদি কেউ না ক'র্‌ত,

তবে সমাজ কেমন ক'রে চ'ল্‌ত? কিন্তু যেরূপ দেখা যায়, তাতে অবৈধ প্রণয়ের কথা আসে না। ওটা সমাজ-পতিদের বাহাদুরি মাত্র।‡ মোটের উপর, অসবর্ণ-বিবাহে জাত সন্তানদের পিতার বা মাতার জাতি হওয়া উচিত ছিল।

এখন সব বুঝ্‌তে পার্‌লে কি?

কেশব।—হাঁ, বাবা। এত দিনে একটা মস্ত পর্দ্দা আমার চোখের সাম্‌নে থেকে স'রে গেল। ক্রমে আমার কাছে বোধ হ'চ্ছে দুনিয়াটা একটা হাওয়া বাজির উপর চ'ল্‌ছে, সব যেন ছেলেখেলা। কি ধর্ম্ম-রাজ্যে, কি সমাজে, কোথায়ও খাঁটি ভাবে কিছু হ'চ্ছে না। আসল জিনিস যে কোথায় ডুবে গিয়েছে, তা খুঁজেও পাওয়া কঠিন। মানুষগুলো মিথ্যার হাট বাজারে মজ্‌গুল্‌ হ'য়ে ছুটে চ'লেছে। মিথ্যা ভাবে মেতে কি দম্ভ অহঙ্কার অভিমান নিয়ে পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি ক'র্‌ছে! অশান্তি হবে না কেন? ছড়াবে অশান্তির বীজ, ফ'ল্‌বে কি শান্তি? হা ভগবান্‌! এ তোমার কেমন খেলা! বাবা, জগতে কি পূর্ণ শান্তি আনা যাবে না? বাবা, আমার মনে হয়, যদি এ ক্ষুদ্র প্রাণ বলি দিয়েও জগতে প্রকৃত সুখ শান্তি আন্‌তে পার্‌তাম।

পাগল।—হাঁ রে বেটা, যা ব'লেছিস্‌ তা অতি সত্য। যাদের চোখ ফুটেছে, তাদের কাছে দুনিয়াটা ঐ প্রকারই বোধ হয়। তোরই মত প্রাণের আবেগ নিয়ে, যুগ যুগান্তর ভ'রে কতজন প্রাণপণে চেষ্টা ক'রেছে, জীবন বলি দিয়েছে, তাতে যতটুকু যায়গায় যতটুকু শান্তি আশা সম্ভব, তাই এসেছে। এ মায়ার রাজ্যে সর্ব্বত্র পূর্ণ শান্তি আস্‌তে পারে না। অশান্তি যদি একবারে দূর হ'য়ে যেত, তবে শান্তির কোন আস্বাদই পাওয়া যেত না, শান্তির কোন মূল্যই থাকৃত না। সমস্ত

* মনু ১০।২৪। ‡ভারতের অবজ্ঞাত শ্রেণীর অকপট বান্ধব শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত "জাতিভেদ" নামক পুস্তকের সপ্তম অধ্যায় বিশেষরূপে পাঠ করুন।

জগৎটা যাতে অশান্তির বিষে একবারে পুড়ে ছারখার হ'য়ে না যায়, তারই জন্য ভগবান্ সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে শান্তি-দূত পাঠাচ্ছেন। কতক কতক লোক যাদের মনটা একটু ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তারা সেই শান্তি-দূতের কাছ থেকে উপায় জেনে নিয়ে, সেই পথে চ'লে শান্তি-সুধা পান করছে। এই ত ভগবানের খেলা। এতে তোর অস্থির হবার কিছু নাই। তোর যখন সৌভাগ্য লাভ হ'য়েছে, তুই নিজে শান্তি ভোগ কর্, আর যাদের মধ্যে সম্ভব এবং যে পরিমাণে সম্ভব শান্তি-জল ঢেলে যা, এই তোর কর্ত্তব্য।

কেশব।—আমার জন্ম ধন্য! আমার জীবন ধন্য! পূর্ব্ব জন্মে কত তপস্যাই যেন ক'রেছিলাম, যার ফলে এবার আপনার মত মহা-পুরুষের চরণে আশ্রয় পেয়েছি। আপনার শ্রীমুখের কথা নয়, এ যেন কলসে কলসে অমৃত পান ক'র্‌ছি। আপনাকে যখনি পাই কত কথা জিজ্ঞাসা ক'রে আপনাকে জ্বালাতন করি। বাবা, অধম সন্তানের এ অপরাধ, আপনি দয়াল, আপনি অবশ্য ক্ষমা ক'র্‌বেন। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে বড়ই ইচ্ছা হ'চ্ছে। আচ্ছা, আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নিয়ম আছে, কোন গৃহস্থের হাতে অন্ন খাবে না, তবে ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ খাওয়া যেতে পারে এবং ব্রাহ্মণ-বাড়ীর অন্ন খেতে কোন দোষ নাই। আমার কিন্তু অনেক ঠাকুর বাড়ীর ও ব্রাহ্মণ-বাড়ীর ব্যাপার দেখে সেখানে খেতে ইচ্ছা হয় না, আবার হয় ত ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির অনেক গৃহস্থের হাতে ভাত খেতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয় বটে কিন্তু খাই না, কেন না সম্প্রদায়ের যে নিয়ম তা না মান্‌লে ভারি বিভ্রাটে প'ড়্‌তে হয়। যাই হ'ক, এই নিয়মটার মানে কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

পাগল।—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলা, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ যদি প'ড়্‌তে, তবে এর রহস্য কোন্ দিন বুঝ্‌তে পার্‌তে। এ বিষয়ে

তোমার মনে যে রকম ইচ্ছা হয় ব'ল্লে, সেটা খারাপ নয়, ঠিক ব্যবস্থা মতই হ'য়ে থাকে। অদ্বৈত গোস্বামী প্রভুর কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে এক শিষ্য ছিল। দৈব-ক্রমে গোস্বামী প্রভু তিন শ' টাকা দেনা হ'য়েছিলেন। কমলাকান্ত তাঁকে না জানিয়ে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রকে ঐ দেনা পরিশোধ ক'রে দিবার জন্য পত্র লেখে। এই পত্র কোনক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হাতে প'ড়ে যায়। এই উপলক্ষে মহাপ্রভু প্রথম কমলাকান্তকে শাসন ক'রেছিলেন, তারপর তাকে ব'লেছিলেন, 'রাজার নিকট টাকা চেয়ে নিতে নাই, কারণ রাজারা প্রায়ই বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হ'য়ে থাকে। বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে যদি কিছু নিয়ে ভোগ করা যায়, তবে যে, তা ভোগ করে তার মন মলিন হ'য়ে যায় অর্থাৎ বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে পড়ে। মন মলিন হ'লে ভগবানের ভজন করা যায় না, আর ভগবানের ভজন ক'র্‌তে না পার্‌লে জীবন ত বিফলেই যায়। সুতরাং এ রকম কাজ আর ক'রো না।' এই উপদেশের মধ্যে আছে 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন।' খুব সম্ভব, এই কথার ফলে হ'য়েছে কি, না তুমি যে আচারের কথা ব'ল্‌লে সেই আচার! যা কিছু খাওয়া যায় তারই নাম অন্ন, শুধু ভাত নয়। এখানে 'অন্ন খাইলে এই শব্দ দুটা 'কারো হাতে ভাত খাওয়া' অর্থে ব্যবহার হয় নাই। কেন না ওর আগের লাইন হ'চ্ছে 'প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন' অর্থাৎ রাজার নিকট থেকে টাকা চেয়ে নেওয়া উচিত নয় বা রাজা নিজে ইচ্ছা ক'রে দিলেও নেওয়া উচিত নয়। সুতরাং যারা ভগবানের ভজন করে না, কেবল বিষয়ে ম'জে আছে, তাদের কোন জিনিষই নিতে নাই, এই কথাই তিনি ব'লেছেন। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে প্রকৃত অভিপ্রায় কি। প্রায় গৃহস্থই বিষয়ে আসক্ত দেখা যায়। তাই অধিকাংশ গৃহস্থকেই বিষয়ী বলা যায়। গৃহস্থের বা বিষয়ীর টাকা পয়সা নিবে, চাল ডাল নিবে, তার বাড়ীতে রেঁধে খাবে, তাতে ধর্ম্ম নষ্ট হবে না,

তার হাতে ভাত খেলেই সর্ব্বনাশ!

এখন ঠাকুর-বাড়ী ও ব্রাহ্মণ-বাড়ী খাবার কথা শোন। ঠাকুর-বাড়ীতে কেবল দেবতার পূজা, ভগবানের গুণ-গান, আরাধনা, সাধু সন্তের আগমন ও বাস হয়। সুতরাং সেটা ধর্ম্মেরই মন্দির। সেখানে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। কাজেই সে অন্ন অতি পবিত্র, তা খেলে প্রাণে ভগবানের প্রতি ভক্তির উদয় হয়। ব্রাহ্মণের বাড়ীও সেই প্রকারই। ব্রাহ্মণ ত সরল, পবিত্র, সদাচারী, সচ্চরিত্র, পর-দুঃখে কাতর, পর-হিতৈষী, ভজন-শীল, সর্ব্বত্র সমদর্শী অর্থাৎ সর্ব্বত্র ভগবান্‌কেই দেখেন। তাঁর বাড়ীতে দোষের বা পাপের কোন কাজ হয় না, যা কিছু হয় সবই ভগবানের ভক্তিতে ভরা। কাজেই সেখানকার অন্ন অতি পবিত্র। তা খেলে মন পবিত্র হয়, ভগবানে ভক্তি জন্মে ও বাড়ে। এই সব কারণে ঐ দুই স্থানে অন্ন গ্রহণে বাধা নাই। কিন্তু ঐ সব ভাব যেখানে নাই বরং বিপরীত ভাব আছে, সেখানে খেলে মন ত দূষিত হবেই। আবার যে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ঐগুলো সব আছে সে বাড়ীও ত ঠাকুর-বাড়ী বা ব্রাহ্মণ-বাড়ীর সমান। সেখানে খেলে মন পবিত্র না হ'য়ে দূষিত হবার কোন কারণ নাই। বুঝ্‌লে এখন?

গুরুদেবের কথা শুনে কেশবের হৃদয় একেবারে গ'লে গেল। সে আর কোন কথা কইতে পার্‌ল না, কেবল গুরুদেবের চরণ-ধূলি নিয়ে নিজের কপালে ও বুকে মাখ্‌তে লাগ্‌ল। রাত্রি শেষ হ'য়ে আস্‌ছে। পাগল আর বেশীক্ষণ সেখানে অপেক্ষা ক'র্‌ল না। "আমি এখানে আর বেশী দিন থাক্‌ব না। পনর দিনের দিন এখানে আস্‌বি। আর যা জান্‌তে চা'স্, ব'লে যাব" এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে পাগল দ্রুতপদে চ'লে গেল।

ষষ্ঠ রাত্রি।

গুরুর কথা।

—:*:—

গুরু ব্র্হ্মা গুরু র্বিষ্ণুঃ গুরু র্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

'গুরুদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এমন কি পর-ব্রহ্ম-স্বরূপ। সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।

চৌদ্দটা দিন কেশব অতি কষ্টে কাটিয়েছে। 'গুরুদেব আর বেশী দিন এ দেশে থাক্‌বেন না! আনন্দের বাজার ভেঙ্গে যাবে'! কেশবের মনে কেবল এই চিন্তা। সে আজ মধ্য-রাত্রিতে সেই মাঠে এসে হাজির, দেখে পাগল সেখানে তার অপেক্ষায় ব'সে আছে। দণ্ডবৎ ভুমিতে প'ড়ে প্রণাম ক'রে কেশব তাঁর কাছেই ব'স্‌ল।

পাগল।—আজ কি শুন্‌তে চা'স্‌?

কেশব।—বাবা, আপনাকে আর দেখ্‌তে পাব না ভেবে প্রাণটা অস্থির হ'য়েছে। আর কি-ই বা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, কি-ই বা শুন্‌ব? আজ আপনার তত্ত্বই জান্‌তে চাই। আপনাকে নিয়েই জীবন কাটাব।

আচ্ছা, বাবা, অনেকে বলে, মানুষ কখনো গুরু হ'তে পারে না, এক ভগবান্‌ই গুরু। ভগবান্‌ই পথ দেখিয়ে দিবেন, মানুষকে গুরু করার প্রয়োজন নাই। মানুষ-গুরুকে ভগবানের মত পূজা করা দোষ। মানুষকে ভগবান্‌ ব'লে পূজা করা অন্যায়। এ সব কথা কি ঠিক?

পাগল।—হাঁ, ভগবান্‌ই একমাত্র গুরু। মানুষ গুরু হয় না, ভগবান্‌ই মানুষের মধ্য দিয়া গুরু হন। ভগবান্‌ ত সর্ব্বব্যাপী চিন্ময় ও

আনন্দময় সত্তা। তাঁর কথা শুন্‌তে পারে এ রকম কাণ কয়জনের আছে? দেহে বদ্ধ জীব খুব উঁচু স্তরে না উঠ্‌লে তাঁর কথা শুন্‌তে ও বুঝ্‌তে পারে না। তাই, দেহে বদ্ধ অজ্ঞান জীবের হিতের জন্য, ভগবান্ তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তদের পবিত্র দেহ অবলম্বন ক'রে, জীবের বন্ধন মোচনের এবং পরম আনন্দ প্রাপ্তির উপায় জানান। তত্ত্বজ্ঞানী পরম ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের বিশেষ বিকাশ। এই গুরুর সেবা ক'র্‌তে ক'র্‌তে এবং তাঁর উপদেশ মত ভগবানের আরাধনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে সাধকের হৃদয় যখন বেশ পরিস্কার হ'য়ে আসে, তখন সে নিজের ভিতর থেকেও ভগবানের উপদেশ শুন্‌তে পায়। এই যে নিজের ভিতরের গুরু, এঁকে বলে 'আত্মা-গুরু' বা 'চৈত্য-গুরু'। তুমি যাঁকে গুরু ব'লে গ্রহণ ক'রেছ, ভগবান্ যে শুধু তাঁর মধ্য দিয়াই তোমার সঙ্গে কথা কবেন, তা নয়; অন্যান্য প্রকৃত সাধু মহাপুরুষের ভিতর দিয়াও তিনিই কথা কন্। তবে কি না, যিনি তোমার ভার নিয়েছেন, তিনি তোমার উপকারের জন্য তোমার পক্ষে যখন যেমন কথার দরকার তেমনি কথাই ব'ল্‌বেন, তোমাকে তেমনি ক'রে চালাবেন, তিনি সর্ব্বদার তরে তোমার চালক। আর তিনি তোমার অধিকার বুঝে কথা ব'ল্‌বেন, কাজেই তুমি সেটা যেমন বুঝ্‌বে ও ক'র্‌তে পার্‌বে, অন্য সাধু মহাজনের ভাষা ও ভাব হয় ত তুমি সে ভাবে বুঝে উঠ্‌তেই পার্‌বে না; তবে তোমার সময়-উপযোগী ও অধিকার-উপযোগী কথা যেগুলো তাঁদের কাছে শুন্‌বে, তা অবশ্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। আবার শুধু মানুষ নয়, শাস্ত্রও গুরু হয়, কারণ শাস্ত্র-পাঠে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। এই সব কারণেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে ব'লেছিলেন—

মায়া-মুগ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ-পুরাণ॥

শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥

এ বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের প্রথমেই ব'লেছেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরু-রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষা-গুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্ত-শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্য রূপে।
শিক্ষা-গুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে॥
ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

সাধারণতঃ অজ্ঞান লোকের ধারণা এই যে, দেহটাই মানুষ, তাই যত গোল। প্রকৃত মানুষ কোন্‌টুকু তা যারা জেনেছে, তাদের এ সব বিষয় নিয়ে কোন সন্দেহই আসে না।

এখন বুঝ্‌লে ?—মানুষ-রূপী গুরুর ভিতর দিয়ে, সাধু মহাজনের ভিতর দিয়ে, বিশুদ্ধ মনের ভিতর দিয়ে, সৎ শাস্ত্রের ভিতর দিয়ে ঐ ভগবানের বাণীই আস্‌ছে। ভগবান্ সাধারণতঃ কোন পবিত্র এবং উপযুক্ত আধারের ভিতর দিয়েই কাজ করেন,—যদিও কখন কখন অলৌকিক উপায়েও তাঁর কাজ হ'য়ে থাকে।

গুরু ধরার দরকার নাই, এ কথা যারা মনে করে, তাদের চিন্তা-শক্তি বড়ই দুর্ব্বল। সংসারের যে কোন প্রকার বিদ্যা বা কার্য্য শিক্ষার জন্য তারা গুরু ক'রে থাকে, তার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম, অর্থ-ব্যয় ও ত্যাগ

স্বীকার ক'রে থাকে। কিন্তু ভগবানের তত্ত্ব জান্‌বার নিমিত্ত, ভগবান্‌কে পাবার উপায় শিখ্‌বার জন্য তারা গুরু ক'র্‌তে পরিশ্রম ক'র্‌তে, অর্থ-ব্যয় ক'র্‌তে বা ত্যাগ স্বীকার ক'র্‌তে একেবারেই নারাজ। এটা কতকটা তাদের অভিমান এবং পার্থিব সুখ ও অর্থাদিতে অত্যন্ত আসক্তির নিমিত্তই হ'য়ে থাকে। যদি কোন দরিদ্র লোকের জল-পিপাসা হ'য়ে থাকে, আর সে যদি মনে করে, 'নদীর জল অথবা অন্যের কাটা কূপ বা পুকুরের জল আমি পান ক'র্‌ব না, নিজে কূপ বা পুকুর কেটে তারই জল পান ক'র্‌ব', তা হ'লে তার দশা কেমন্ হয় ভেবে দেখ। যে সব লোক ভাবে যে, শাস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে এবং কোন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির নিকট দীনতা স্বীকার ক'রে শিষ্য না হ'য়ে, নিজের চেষ্টায় এবং মাত্র নিজের অপরিপক্ক বুদ্ধির সাহায্যে ভগবান্‌কে জেনে ফেল্‌বে ও ধ'র্‌বে, তাদের দশাও তেমনি হয়।

'শাস্ত্র ও মানুষ-গুরুর দরকার নাই, ভগবান্‌ই পথ দেখিয়ে দিবেন' এ কথা ব'লে, যারা সৎ শাস্ত্র ও উপযুক্ত গুরুর সাহায্য নিতে চায় না, তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় 'ভগবান্ কি ভাবে পথ দেখাবেন', তা হ'লে তারা হয় ত কোন জবাবই দিতে পার্‌বে না, না হয় উন্মাদের মত যা তা কতকগুলো বাজে কথা ব'ল্‌বে।

আরো একটা কথা বলা দরকার। অনেকে ভাবে, গুরুর নিকট উপদেশ শুন্‌তে হয়, তা উপদেশ যে কোন প্রকারে পেলেই হ'ল, তার জন্য আবার এক জনের কাছে মাথা বিক্রয় করার প্রয়োজন কি? তারা জানে না যে, শুধু উপদেশ জান্‌লেই সব কাজ করা যায় না। গুরুর শক্তি, জ্ঞান ও স্বভাব শিষ্যের উদ্দীপনা জন্মায় এবং তার ভিতরের শক্তিকে জাগিয়ে তুলে। তা গুরু-সেবা ভিন্ন অন্য উপায়ে লাভ হয় না। এটা যে সিদ্ধি লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন, তা সাধক মাত্রেই স্বীকার ক'র্‌বে। সুতরাং উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

যারা জানে যে, মানুষ-গুরুর ভিতর দিয়েই ভগবান্ তাঁ'দিগকে পথ দেখিয়ে অমৃত-সাগরে নিয়ে যাচ্ছেন, তারা গুরুর দেহ অবলম্বন ক'রে সেই ভগবানেরই পূজা ক'রে থাকে। এ তত্ত্ব না বুঝাতেই স্থূল বুদ্ধির লোকেরা এটা মহা-অপরাধের কাজ ব'লে মনে করে। সচ্চিদানন্দ-রূপী ভগবান্‌কে লক্ষ্য ক'রে যেখানেই কোন পূজা বা প্রার্থনা করা যাবে—তা সাকারেই হ'ক আর নিরাকারেই হ'ক—তাই সার্থক হবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কেশব।—বাবা, আমার আর এক কথা মনে হয়, অনেক গুরুরও দোষ আছে। তারা নিজে ভগবানের তত্ত্ব না জেনে এবং সাধন ভজন না ক'রেই, লোক ভুলাবার কতকগুলো কৌশল শিখে গুরু হ'য়ে বসে এবং বেশ পসার প্রতিপত্তি ক'রে অর্থ উপায় ক'রে থাকে। তাদের দ্বারা প্রতারিত হ'য়ে হ'য়েও অনেক লোকে শ্রদ্ধা ভক্তি হারিয়েছে।

পাগল।—হাঁ, তাও অনেক স্থলে হ'চ্ছে। এই শ্রেণীর পাষণ্ড গুরুরা বোধ হয় একবারও ভাবে না যে, তারা নিজেদের জন্য কি ভয়ঙ্কর নরকের পথ পরিষ্কার ক'র্‌ছে। সংসারের জিনিস নিয়ে যারা প্রতারণা ক'র্‌ছে তাদেরি কত যাতনা ভোগ ক'র্‌তে হবে তার ঠিক নাই। আর এরা ক'র্‌ছে কি?—না যে ভগবানের পথে গেলে লোকে বিষয়-বাসনা হ'তে মুক্ত হ'য়ে পরম শান্তি পায়, সেই ভগবানের নাম ক'রে লোককে বিপথে চালিয়ে তাদের ইহকাল ও পরকালের মাথা খাচ্ছে, আর তাদেরে ফাঁকি দিয়ে অর্থাদি নিয়ে নিজেরা কলুষিত সংসার-সুখ ভোগ ক'র্‌ছে! যে সব অজ্ঞান লোক ধর্ম্ম-কর্ম্মের ধার ধারে না, কেবল সংসার সুখের জন্য পাপ কর্ম্ম ক'র্‌ছে, তাদের যে ভয়ানক শাস্তি হবে, এদের তার চেয়ে শতগুণে বেশী ভয়ানক শাস্তি ভোগ ক'র্‌তে হবে।

ঐ প্রকার লোকের দ্বারা বঞ্চিত হ'য়েছে ব'লে যারা ধর্ম্ম-পথে যাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে, এখন তাদের কথা বলি। যদি কারো থালা

চুরি যায়, তবে চোরের উপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খাওয়া যেমন তার পক্ষে নির্ব্বোধের কাজ, এদের কাজও তেমনি। সাবধান হ'য়ে, বিশেষ-রূপে পরীক্ষা ক'রে গুরু ধ'র্‌তে হয়। যারা কোন লোকের ভেল্কি দেখে তাকে মহাপুরুষ ব'লে মনে করে এবং তাকে গুরু ক'র্‌লে তাদের সংসারে অনেক সুখের জিনিস লাভ হবে, পাপ ক'রে এ জীবনে শাস্তির হাত এড়ান যাবে, এই মনে ক'রে তাকে গুরু করে, তারা ঠক্‌বে না ত ঠক্‌বে কে? যারা ভগবান্‌কে সত্যই চায়, তারা সংসারের সুখে বিরক্ত হ'য়েছে, এ কথা অতি সত্য। সুতরাং যাকে ভগবানের ভক্ত, শান্ত-চিত্ত, সাধন ভজনে আসক্ত, পবিত্র-চরিত্র, পবিত্র কথায় ও ভগবানের কথায় মত্ত, বিষয়-ভোগে লোভ হীন, লোকের হিতকারী, ভগবানের কথা যুক্তি শাস্ত্র ও নানাপ্রকার উদাহরণের দ্বারা সুন্দররূপে বুঝাতে সমর্থ, এরূপ ব'লে তারা মনে করে তাকেই গুরু করে। এই সব বিশেষ ক'রে দেখে শুনে গুরু ধ'র্‌লে আর ঠক্‌তে হয় না।

যে সব ভগবদ্ভক্ত সাধক বা সিদ্ধপুরুষ লোকের হিতের নিমিত্ত শিষ্য ক'রে থাকেন, তাঁদেরও যাকে তাকে শিষ্য করা উচিত নয়। ধন জন মান লাভের জন্য, অথবা ইচ্ছা পূর্ব্বক লোকের সর্ব্বনাশ ক'রেছে, হঠাৎ ঠেকে প'ড়ে কেবল সেই বিপদ হ'তে নিস্তার পাবার নিমিত্ত, কিংবা সাধুদের মধ্যে কার সাধন-প্রণালী কি প্রকার তা জান্‌বার বা তাদের গুহ্য রহস্য কি মাত্র তাই শুন্‌বার জন্য কেউ শিষ্য হ'তে এসেছে, এটা বুঝ্‌তে পার্‌লে তাকে শিষ্য করা উচিত নয়, কারণ সে সাধন ভজনও ক'র্‌বে না এবং ভগবান্‌কেও চায় না।

কেশব।—হাঁ, বাবা, তাই প্রায় দেখা যায়—যে যেমন লোক তার কাছে তেমনি লোকই আসে। আচ্ছা, বাবা, আর একটা কথা আমার জান্‌তে ইচ্ছা হয়। অনেকে বলে, ভক্তি-মার্গে 'যম ও নিয়মের, দরকার নাই, ও সব যারা যোগী তাদেরই দরকার। আবার এমন কথাও

অনেকে বলে, কলিতে মানুষ এত কঠিন কাজ ক'র্‌তে পারে না, কাজেই যোগ-মার্গে একটু ষট্‌চক্র ভেদ বা ধ্যান এবং জ্ঞান-মার্গে একটু বিচার ক'র্‌লেই হ'য়ে যায়, কলিতে বেশী কিছু দরকার নাই। এ কি ঠিক?

পাগল।—ওরে বেটা, সাধনার চরম লক্ষ্য ত বুঝ্‌তে পেরেছিস্‌ —বিষয়-ভোগ ও বিষয়-চিন্তা থেকে মনটাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে নিয়ে এসে পরম-আনন্দ-স্বরূপ ভগবানেই একেবারে ডুবিয়ে দেওয়া, সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্ব স্থানে তাঁকেই দেখা, অনুভব করা। কেমন কি না? এখন যে উপায়ে কারো মন এমনি ধারা হ'য়ে যায়, সেই তার সাধনা। একটু নাম ক'র্‌লেই, একটু ষট্‌চক্র ভেদ কল্পনা ক'র্‌লেই বা ধ্যান ক'র্‌লেই অথবা একটু বিচার ক'র্‌লেই যদি কারো মনের ঐ অবস্থা এসে যায়, তবে সে আর অন্য কিছু ক'র্‌বে কেন?—আর সে তা ক'র্‌তেও পারে না। প্রত্যেক শাস্ত্রেই বলা আছে, 'এই প্রকার কি ঐ প্রকার সাধনা ক'র্‌লেই হ'য়ে যায়, আর কিছু করা লাগে না'। তারপরই অনেক নিয়ম পালনের কথা ঐ সব শাস্ত্রের মধ্যেই বলা হ'য়েছে। এরূপ করার কারণ এই যে, সেই সব উপায় অবলম্বন ক'র্‌লে মন বিষয় হ'তে দূরে থাক্‌বে, সুতরাং নির্ম্মল হবে এবং ক্রমে ভগবানে লেগে থাক্‌বে। যদি কলিকালের লোক দুর্ব্বল ব'লে ওগুলোর এখন কোন প্রয়োজনই না থাকৃত তবে এখনকার শাস্ত্রে মিছামিছি ওগুলো লিখ্‌বারই কি দরকার ছিল? অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ (মাত্র জীবন রক্ষার জন্য যা দরকার তার বেশী গ্রহণ না করা) এই-গুলোকে যোগশাস্ত্রে বলা হ'য়েছে 'যম', আর শৌচ (ভিতর ও বাহিরে পবিত্রতা), সন্তোষ (ন্যায় পথে থেকে যা পাওয়া যায় তাতেই তুষ্ট হওয়া), তপস্যা (একাদশী ব্রত প্রভৃতি দ্বারা কষ্ট সহিতে অভ্যাস করা), স্বাধ্যায় (ভগবানের নামাদি জপ, সৎ শাস্ত্র পাঠ) এবং ঈশ্বর-প্রণিধান (ঈশ্বরের ধ্যান বা তাঁর দিকে মন একাগ্র ক'রে রাখা), এইগুলোকে

বলা হ'য়েছে 'নিয়ম'। ভক্তি শাস্ত্রে ঐ দুই শব্দ ব্যবহার না ক'র্লেও ঐ দুই শব্দ দ্বারা যে সকল কার্য্য বুঝায় তা ক'র্তে বলা হ'য়েছে। কাজেই শুধু কীর্ত্তন, জপ, পূজা, ধ্যান বা বিচার ক'রেও যাদের মন স্থির হ'চ্ছে না, নির্ম্মল হ'চ্ছে না, ভগবানের পাদপদ্মে লেগে থাক্‌ছে না, তারা যদি ঐ সব নিয়ম পালন না করে, তবে তাদেরই ক্ষতি, তাদের সিদ্ধিলাভ হবে না। 'যম ও নিয়ম' এই দুটা শব্দ শুনেই যারা শিউরে উঠে তারা ঐ নাম দুটা ব্যবহার না করুক, কিন্তু উহার কাজগুলো তাদের বিশেষ যত্ন ক'রে অভ্যাস ক'র্তেই হবে যতদিন তাদের চিত্ত নির্ম্মল না হয় ও ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ না হয়। এ সব যার নাই তাকে সাধক না ব'লে পশুর অধম বলায় কোন দোষ দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে, মধ্যলীলায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বিধি-মার্গের সাধন সম্বন্ধে যে সব কথা ব'লেছেন, সেগুলো একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

তবে, অতি দুর্ব্বল সাধকদের জন্য একটা ব্যবস্থা হ'তে পারে। যাদের বাধা বিঘ্ন বড় বেশী অথবা মন্দ অভ্যাস যাদের হাড়ে মাংসে ঢুকে গিয়েছে, তাদের পক্ষে ভগবানের নাম গান করা বা জপ করা অথবা অন্য কোন সাধনা কিছু কিছু করা অর্থাৎ 'নিয়মের' দুটা অঙ্গ 'স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান' কিছু কিছু করা, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে 'যম ও নিয়মের' বাকীগুলো ক্রমে যথা-সাধ্য অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য। কেননা সেগুলো তাদের আয়ত্ত হ'তে হয় ত কয়েক জন্ম বা কত জন্ম কেটে যেতে পারে। ঈশ্বর-প্রণিধানই উদ্দেশ্য, অন্যগুলো তার সহায়। 'যম ও নিয়মের' অন্যান্য অঙ্গ ভাল অভ্যাস না হ'লে 'ঈশ্বর-প্রণিধান' ঠিক মত হ'তে পারে না। এই নিমিত্তই অনেক সাধু মহাত্মা দুর্ব্বল সাধকদের জন্য কৌশলে এই ব্যবস্থাই ক'রে থাকেন। এতে এ কথা বুঝায় না যে, কলিতে ও সকলের দরকারই নাই।

এই কথা ব'লতে ব'লতেই পাগল উঠে দাঁড়া'ল। কেশব বুঝ্‌ল গুরুদেব এখন চ'লে যাবেন। সে তাঁর চরণ দুখানিতে মাথা রেখে কাঁদতে লাগ্‌ল। কেন প্রাণ এমন হ'ল, কেন কান্না আস্‌ছে, কেশব তা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছে না, কেবল তার হৃদয় আকুলি বিকুলি ক'র্‌ছে, যেন অতি বড় মূল্যবান্ কোন পদার্থ হারিয়ে গিয়েছে। পাগল কেশবের মাথা থেকে পিঠের মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে হাত বুলা'তে লাগ্‌লেন। কেশবের শরীরে রোমাঞ্চ হ'চ্ছে। পাগল ব'লতে লাগ্‌লেন, "কাঁদিস্ কেন, বাবা? কি হ'য়েছে? এই দেহে আর দেখা পাবি না? তাতে কি হ'ল? তোর যখনি দরকার, ধ্যান ক'র্‌লে এই প্রকারের সূক্ষ্ম শরীরের দর্শন পাবি। তোর যখন যা দরকার আমি তোর অন্তরে থেকেই তোকে জানিয়ে দেব। দেহের নাশ আছে, আত্মার নাশ নাই, আত্মা অখণ্ড অব্যয়—এ তত্ত্ব ত তোকে বিশেষ ক'রে জানিয়েছি। তাই সর্ব্বদা ভাব্‌বি, তাই দেখ্‌বি। যে রত্ন লাভ ক'র্‌লি, তোর জীবন ধন্য। এখন বিশ্বময় ভগবানের সেবায় ও আত্ম-ধ্যানে ডুবে থাক্। সময়ে তোরও ঐ নশ্বর দেহের পতন হবে, তার পর তুই আর আমি এক হ'য়ে যাব,—এখনও একই আছি, প্রারব্ধ কর্ম্ম-ফলের জন্য মাঝে মাঝে ভুলে যা'স্, তাই বিরহ-জ্বালা আসে। ভয় নাই, বাছা। আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি, মুক্ত হও, সর্ব্বময় বিষ্ণু-পাদপদ্মে নির্ভয়ে ও আনন্দে বিচরণ কর।" এই ব'লে পাগল দ্রুতবেগে কোথায় চ'লে গেলেন! কেশব পৃথিবী যেন শূন্যময় দেখ্‌তে লাগ্‌ল, তার চক্ষু দিয়ে জল-ধারা প'ড়্‌ছে, হৃদয়ে যেন পাষাণ চাপা প'ড়েছে—প্রাণ উদাস! কতক্ষণ এই ভাবে ব'সে থেকে থেকে, কেশব গুরুদেবের শেষ কথাগুলো ভাব্‌তে ভাব্‌তে, স্ববশে নয়—যেন অভ্যাসের বশে, নিজের আখ্‌ড়ায় ফিরে এল।

উপসংহার।

কেশব বাবাজি এখন আর 'কেশব বাবাজি' নন্। এখন অনেক লোকেই তাঁকে "বাবাজি মহারাজ" ব'লে ডাকে। 'বাবাজি' কথাটা এদেশে অনেক তথা-কথিত শিক্ষিত লোকের কাছে একটা ঘৃণার শব্দ হ'য়ে প'ড়েছে, কিন্তু কথাটা বাস্তবিক তা নয়। বাবা—পিতা, জ্ঞান-দাতা। শুধু জ্ঞান-দাতা পিতা নয়, সম্ভ্রম দেখাবার জন্য তার সঙ্গে 'জি' শব্দ লাগান হ'য়েছে। "জি" অর্থ মহাশয়। সুতরাং "বাবাজি" অর্থ 'তত্ত্বজ্ঞান-দাতা পিতা মহাশয়।' হিন্দু ভিখারী দেখ্‌লেই অনেকে একটু নাক কুঁচিয়ে ব'ল্‌বে, 'ঐ যে বাবাজি যায়, ঐ যে বৈরাগী যায়।' বাবাজি শব্দের অর্থ বলা হ'য়েছে, এখন 'বৈরাগী' শব্দ। বৈরাগী হওয়া মুখের কথা নয়। বহু ভাগ্যের ফলে বিবেক (নিত্যানিত্য বিষয়ে জ্ঞান) জন্মে, এক ভগবান্‌ই নিত্য (সত্য) আর সব অনিত্য (মিথ্যা) এরূপ জ্ঞান জন্মে। বিবেক হ'লে তবে অনিত্য বস্তু সকলে বিরাগ বা বিরক্তি জন্মে, আর নিত্য বস্তুতে অর্থাৎ ভগবানে অনুরাগ জন্মে। ঐ অবস্থা এলে তবে বৈরাগী হয়। যাকে তাকে বৈরাগী বা বাবাজি বলা যায় না। তারপর 'মহারাজ' কা'কে বলা যায় ? যে রাজা অন্য রাজার নিকট কর পান এবং যাঁহার অধীনে সামন্ত রাজা আছেন তিনিই মহারাজা। কিন্তু, পশ্চিম দেশে ভক্ত লোকেরা সাধু মহন্ত এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও সম্ভ্রম দেখাবার নিমিত্ত 'মহারাজ' ব'লে থাকেন। কাজেই কেশব এখন এক জন সম্মানিত সাধু।

মূর্খ লোক বা সংস্কারে আবদ্ধ লোক, লেখাপড়া বা শাস্ত্রাদি জান্‌লেও, যা সকলকে বরাবর ক'র্‌তে দেখ্‌ছে বা নিজে ক'রে আস্‌ছে,

তা হাজার বুঝ্‌লেও ছাড়্‌তে পারে না। যাদের হৃদয়ের বল বেশী এবং বিচার-শক্তি প্রবল, তারা কিন্তু যা ঠিক ব'লে বোঝে, কারো কথায় কাণ না দিয়ে সেই পথেই চলে। এ বিষয়ে বালক এবং যুবকেরাই বেশী অগ্রসর। বৃদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ কেউ পূর্ব্ব সংস্কার ছাড়্‌তে পারে, কারণ তাদের চির জীবনের বদ্ধ সংস্কার তাদের অনেককেই প্রবল ভাবে বাধা দেয়। বালক ও যুবকেরা কিন্তু কেশবের উদার হৃদয় ও সেবা-ধর্ম্ম দেখে পূর্ব্বেই তার প্রতি আসক্ত হ'য়েছিল, তবে তাদের প্রশ্নের সন্তোষ-জনক উত্তর না পাওয়াতেই তাকে ততটা শ্রদ্ধা দেখাতে পার্‌ছিল না। কয়েক মাস যাবৎ কেশবের মুখে নানা বিষয়ে যুক্তি-পূর্ণ যথার্থ ব্যাখ্যা সকল শুনে শুনে তারা চিন্তা ক'র্‌ছিল, "কেশব বাবাজি কি কালিদাসের মত সরস্বতীর বর পুত্র হ'ল নাকি? এতদিন ত তাকে এত জোরে কথার উত্তর দিতে দেখি নাই, দু' চার কথা ব'লেই ব'ল্‌ত 'আমি এটা ঠিক ব'ল্‌তে পার্‌ব না বা আমি সে কথা জানি না।'" কেশবের ভিতর যে আগুন ঢুকেছে তা ত কেউই জান্‌ত না। যা হ'ক, কেশবের ব্যাখ্যা শুনে এবং কার্য্য দেখে অনেক বালক ও যুবকেরই প্রাণ গ'লে গিয়েছিল, দু' একজন বৃদ্ধও মেতে গিয়েছিল। ক্রমে প্রকৃত রহস্য বুঝ্‌বার জন্য ও প্রকৃত আনন্দ আস্বাদন ক'র্‌বার নিমিত্ত তাদের অনেকেই কেশবের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছিল এবং কেশবের নির্দ্দেশ মত সাধন ভজন ক'রে আনন্দ সম্ভোগ ক'র্‌ত ও জীব সেবায় নিযুক্ত থাক্‌ত।

বাবাজি মহারাজকে এখন আর সেবা-ধর্ম্মের জন্য ছুটাছুটি ক'র্‌তে হয় না। শিষ্য ও ভক্তেরাই সে ভার নিয়েছে, তবে বিশেষ কঠিন কঠিন স্থানে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে তাদের সাহায্য করেন এবং যেখানে হয়ত যাবার মত লোক পাওয়া যায় না, সেখানে তিনি নিজে গিয়ে কাজ করেন। নচেৎ তাঁর অধিকাংশ সময়ই নিজের সাধন ভজনে এবং শিষ্য ও ভক্তদের উপদেশ-কার্য্যে কাটে। তাঁর শিষ্য শিষ্যাণীদের মধ্যে সব

বর্ণের লোকই আছে এবং তাদের মধ্যে এমন মাখামাখি যেন সব সহোদর ভাই বা সহোদরা ভগ্নী। কেশব বাবাজি জীবন ভ'রে যে সুখের কথা স্বপ্নবৎ দেখ্‌তেন এখন তা হাতে হাতে ফ'লেছে। তিনি কিন্তু আচারে, লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে আগের মতই আছেন, যেন সরল-প্রাণ বালক। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁর কোন অহঙ্কার আসে নাই, তিনি আগের চেয়েও নরম হ'য়ে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে তাঁর দুচোখের জল গড়িয়ে প'ড়্‌তে দেখা যায়, এটার কারণ লোকে বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু, কারণ আর কিছুই না; গুরুদেবের এবং শ্রীভগবানের করুণার কথা যখনই মনে হয়, তখনি তাঁর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভ'রে যায়, তাই বাহিরে অশ্রু-ধারা রূপে দেখা দেয়। যে কেউ তাঁর কাছে আসুক না কেন, তারই হৃদয় অন্ততঃ সাময়িক শান্তিলাভ করে। এই ভাবে কেশব বাবাজি এ অঞ্চলে এক যুগান্তর এনে ফেলেছেন। তাঁর গুণের সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় দূর দূর স্থানেরও অনেকে এসে তাঁর ভক্ত বা শিষ্য হ'চ্ছে।

দিন এই ভাবে যাচ্ছে। এই শান্তি-রাজ্যে তাঁর আর কোনই দুঃখ নাই, দুঃখের মধ্যে এই যে, গুরুদেবকে স্থূল-দেহে আর দেখ্‌তে পান না, আর যে সে ভাবে দেখা পাবেন সে আশাও নাই। গুরুদেবের উপদেশে তাঁর দেহাত্ম-জ্ঞান দূর হ'য়েছে, কিন্তু হ'লে কি হয়? গুরু-দেবের শ্রীচরণে অসীম কৃতজ্ঞতা তাঁকে সেই গুরু-মূর্ত্তির কথা ভুল্‌তে দেয় না। তত্ত্ব-জ্ঞানের বিকাশ হওয়ায় তিনি সবই গুরুর প্রকাশ ব'লে দেখ্‌ছেন, সবই গুরুর লীলা ব'লে বোধ ক'র্‌ছেন, কিন্তু তবু তাঁর সেই মূর্ত্তি—সেই প্রশান্ত এবং স্নেহভরা, বৈরাগ্যের জীবন্ত ছবি মূর্ত্তিখানি তাঁর হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছে, চোখ সেই রূপ-সুধা পান করার জন্য লালায়িত। কখন কখন তাঁর ধ্যানের সময় সেই রূপ-রাশি ভেসে উঠে, তখন তিনি আনন্দে আত্ম-হারা হ'য়ে যান।

গুরুদেবের সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর দীর্ঘ চার মাস এই ভাবে কেটে গিয়েছে। আজ সকালে বিছানা থেকে উঠা অবধি বাবাজি মহারাজের হৃদয় কি যেন এক অজানা বেদনায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত দিনের মধ্যে স্নান আহারাদি কিছুই ক'র্‌লেন না, কারো সঙ্গে কথাও ব'ল্‌লেন না। গম্ভীর হ'য়ে বিছানায় একই ভাবে ব'সে আছেন। শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই আস্‌ল, কেউ কেউ কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেও চেষ্টা ক'র্‌ল, কিন্তু সেই গম্ভীর প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে আর কিছুই ব'ল্‌তে পার্‌ল না। তিনি কি দেখ্‌ছেন? তিনি যে নিজের আখ্‌ড়ায় আছেন, তাও তাঁর জ্ঞান নাই। তিনি দেখ্‌ছেন—তিনি কোথায় কোন্ এক অজানা দেশে, এক গভীর জঙ্গলের ভিতরে, এক মনোহর পুষ্করিণীর ধারে ব'সে আছেন। চারিদিকে সুন্দর সুগন্ধি ফুলের বাগান। সেখানে যে আলো দেখ্‌ছেন সেটা সূর্য্যের কি চন্দ্রের আলো, তা কিছু বুঝা যায় না—সূর্য্যের আলোর মতই পরিষ্কার কিন্তু তাতে তেজ নাই, চন্দ্র-কিরণের মত শীতল। সম্মুখে এক বাঁধা ঘাট্‌লায় গুরুদেব প্রসন্ন-মুখে ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় ব'সে আছেন। বাবাজি অপলক আঁখিতে সেই মূর্ত্তি দর্শন ক'র্‌ছেন। কত সময় এই ভাবে কেটে গিয়েছে তা তাঁর জ্ঞান নাই। রাত্রি যখন প্রায় অবসান (এ যে কোন্ সময় তা তিনি কিছু বুঝ্‌ছিলেন না), তখন তিনি দেখ্‌লেন গুরুদেবের মুখ-মণ্ডল এক অপূর্ব্ব আলোকে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল, ক্রমে সমস্ত শরীর জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে গেল, কতক্ষণ পর সে আলো অদৃশ্য হ'ল—গুরুদেবের দেহ আস্তে আস্তে পঞ্চভূতে মিশে গেল! ক্রমে সে পুষ্করিণী, সে বাগান, সমস্তই শূন্যে মিশে গেল, বাবাজি মহারাজের বাহ্য জ্ঞান আস্‌ল! তিনি উন্মাদের ন্যায় চারদিকে চাইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠ্‌লেন, "গুরুদেব! বাপ! কোথায় গেলে!" সেই কান্নার পর পরই কি একটা অস্ফুট মধুর ধ্বনি শোনা গেল। পাশের শিষ্য ও ভক্তেরা কিছুই বুঝ্‌তে পা'র্‌ল না, কিন্তু বাবাজি মহারাজ

শুন্‌লেন, "কেঁদ না, বাপ, শান্ত হও। আমি তোমার মধ্যেই আছি!"

রাত্রি প্রভাত হ'ল। বাবাজি মহারাজ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ক'র্‌লেন, স্নান সন্ধ্যা বন্দনাদি ক'র্‌লেন। শিষ্য সেবকেরা যত্ন সহকারে তাঁহাকে আহারাদি করা'ল। আহারান্তে শিষ্য সেবকদের সাহায্যে তিনি তাঁর শয়ন-গৃহে একটী মাটীর বেদি রচনা ক'র্‌লেন। গত বৎসর ভাদ্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে গুরু-মহারাজ যে রাত্রে তাঁর আখ্‌ড়ায় এসেছিলেন, সেই দিন তিনি তাঁর চরণ থেকে কিছু কাদা রেখে দিয়েছিলেন। কেন রেখেছিলেন, তাও তিনি জানেন না। বাসনার উদয় হওয়া মাত্রই, যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত, তিনি তা রেখেছিলেন। সেটা তিনি বেশ ক'রে শুকিয়ে, একটী কৌটায় যত্নে রেখে, বাক্সে আটকিয়ে রেখেছিলেন। আহারের পর মনে পড়ায়, তিনি আজ সেই কৌটা অতি ভক্তি সহকারে বের ক'র্‌লেন, সেই পবিত্র মাটী একটু ভেঙ্গে নিয়ে প্রণাম ক'রে আহার ক'র্‌লেন। তিনি ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে কখন মধুর ঝঙ্কারে প্রণব-ধ্বনি ক'র্‌ছেন, কখনো বা মধুর কণ্ঠে গাইছেন "হরে মুরারে মধু কৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে"। শিষ্য এবং ভক্তগণও প্রেমভরে তাঁর সুরে সুর মিশিয়েছেন। ভক্তি-গঙ্গায় মধুময় তরঙ্গ উঠেছে। এই অবস্থায় বাবাজি মহারাজ সেই কৌটাটী, একটী খুব ছোট লোহার বাক্সের ভিতর রেখে, ঐ বেদির ঠিক মধ্যভাগে একটী গর্ত্তে স্থাপন ক'র্‌লেন এবং গর্ত্তটী মাটী দিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন। সকলেই তারপর সেই বেদি-মূলে ভক্তিভরে প্রণাম ক'র্‌লেন। বাবাজি মহারাজের বাস-গৃহ মন্দিরে পরিণত হ'ল। তিনি জীবনের অবশিষ্ট কালের অধিকাংশ সময় সেই বেদি-মূলে সাধনা ক'রে কাটিয়েছিলেন।

বাবাজি মহারাজের অপ্রকট হবার পর থেকে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণ সেই আখ্‌ড়া ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত কার্য্য-প্রণালী চালাতে লাগ্‌ল।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। —সমাপ্ত—

শুন্‌লেন, "কেঁদ না, বাপ, শান্ত হও। আমি তোমার মধ্যেই আছি!"

রাত্রি প্রভাত হ'ল। বাবাজি মহারাজ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ক'র্‌লেন, স্নান সন্ধ্যা বন্দনাদি ক'র্‌লেন। শিষ্য সেবকেরা যত্ন সহকারে তাঁহাকে আহারাদি করা'ল। আহারান্তে শিষ্য সেবকদের সাহায্যে তিনি তাঁর শয়ন-গৃহে একটী মাটীর বেদি রচনা ক'র্‌লেন। গত বৎসর ভাদ্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে গুরু-মহারাজ যে রাত্রে তাঁর আখ্‌ড়ায় এসেছিলেন, সেই দিন তিনি তাঁর চরণ থেকে কিছু কাদা রেখে দিয়েছিলেন। কেন রেখেছিলেন, তাও তিনি জানেন না। বাসনার উদয় হওয়া মাত্রই, যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত, তিনি তা রেখেছিলেন। সেটা তিনি বেশ ক'রে শুকিয়ে, একটী কৌটায় যত্নে রেখে, বাক্সে আটকিয়ে রেখেছিলেন। আহারের পর মনে পড়ায়, তিনি আজ সেই কৌটা অতি ভক্তি সহকারে বের ক'র্‌লেন, সেই পবিত্র মাটী একটু ভেঙ্গে নিয়ে প্রণাম ক'রে আহার ক'র্‌লেন। তিনি ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে কখনো মধুর ঝঙ্কারে প্রণব-ধ্বনি ক'র্‌ছেন, কখনো বা মধুর কণ্ঠে গাইছেন "হরে মুরারে মধু কৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে"। শিষ্য এবং ভক্তগণও প্রেমভরে তাঁর সুরে সুর মিশিয়েছেন। ভক্তি-গঙ্গায় মধুময় তরঙ্গ উঠেছে। এই অবস্থায় বাবাজি মহারাজ সেই কৌটাটী, একটী খুব ছোট লোহার বাক্সের ভিতর রেখে, ঐ বেদির ঠিক মধ্যভাগে একটী গর্ত্তে স্থাপন ক'র্‌লেন এবং গর্ত্তটী মাটী দিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন। সকলেই তারপর সেই বেদি-মূলে ভক্তিভরে প্রণাম ক'র্‌লেন। বাবাজি মহারাজের বাস-গৃহ মন্দিরে পরিণত হ'ল। তিনি জীবনের অবশিষ্ট কালের অধিকাংশ সময় সেই বেদি-মূলে সাধনা ক'রে কাটিয়েছিলেন।

বাবাজি মহারাজের অপ্রকট হবার পর থেকে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণ সেই আখ্‌ড়া ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত কার্য্য-প্রণালী চালাতে লাগ্‌ল।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। —সমাপ্ত—